৪৪তম বর্ষ • ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
উৎস মানুষের পুরনো সংখ্যা থেকে		২
আহরণ		৫
স্মারক বক্তৃতা	রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়	৭
উচ্চমেধার মিথ	আশীষ লাহিড়ী	১১
করে দেখো ভালো লাগবে	শুভেন্দু দাশগুপ্ত	১৪
দুখু মাঝি	সঞ্জয় অধিকারী	১৫
ঋতু কথন	যশোধরা রায়চৌধুরী	১৬
বিজ্ঞান ও বাস্তুবিদ্যা	পার্থপ্রতিম বিশ্বাস	২০
বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্ব পরিবেশ	প্রনবেশ সান্যাল	২৪
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা	অতনু বিশ্বাস	২৭
ভয়ংকরী তিস্তা	শ্যামল ভদ্র	৩০

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪
কার্যালয় ঃ খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪, এস - ৩, পোঃ- (আর) গোপালপুর নারায়ণপুর কলকাতা- ৭০০১৩৬
ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/
ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com
ফেসবুক:http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

দেখতে দেখতে উৎস মানুষ ৪৩তম বছর পার করে ফেলল। ৪৪তম বছরে পা দিয়ে মনে হল পুরনো সংখ্যাগুলোতে কী এমন লেখা বেরোত, যা উৎস মানুষকে এত জনপ্রিয় করেছিল? কয়েকজন পাঠক বন্ধুও বললেন পুরনো সংখ্যার অগ্রন্থিত লেখাগুলো একে একে পুনর্মুদ্রণ করার কথা। খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ। তেমন লেখার সংখ্যাও তো কম নয়। 'পুরনো উৎস মানুষের পাতা থেকে' এই সংখ্যা থেকে চালু হল।

ত্রয়োদশ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা হয়ে গেল গত ১৮ নভেম্বর ২০২৩, ইন্দুমতী সভাগৃহে। অধ্যাপিকা রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়-এর স্মারক বক্তৃতা এই সংখ্যায় দেওয়া হল। অনুষ্ঠানে শ্রীমতি কাবেরী রায় ও মেধা জানা দুটি গান শুনিয়েছিলেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা স্মারক বক্তৃতা আয়োজনের কথা সাধ্যমতো প্রচার করার চেষ্টা করি। উৎস মানুষ-এর ফেসবুকেও অনুষ্ঠানের খবরটি দেওয়া হয়। ফেসবুকে অনেকেই তাতে লাইক দেন। ঘটনা হল অনুষ্ঠানে তাদের দেখা পাওয়া যায় না।

অনেকেই বলেন উৎস মানুষের আগের ঝাঁঝটা যেন আর পাই না, উৎস মানুষ-এর আড্ডা কেন হয় না ইত্যাদি। অমরা জনা পাঁচেক সিনিয়র সিটিজেন উৎস মানুষকে বেশ কষ্ট করেই বাঁচিয়ে রেখেছি। সুধী পাঠক ও লেখকদের সহযোগিতায় উৎস মানুষ চলছে তা বলাই বাহুল্য।

প্রতিবারের মতো এবারও কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় উৎস মানুষের স্টল থাকছে। তবে বইমেলায় অংশগ্রহণ করার খরচ যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে করে আমাদের মতো প্রকাশকরা ক'দিনই বা এই চাপ নিতে পারবে জানিনা।

প্রতিবার বইমেলায় আমরা নতুন বই বের করার চেষ্টা করি। আসন্ন কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় সমাজকর্মী বোলান গঙ্গোপাধ্যায়-এর লেখা '*জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে*' বইটি প্রকাশিত হবে। উন্নয়নের আগ্রাসন, প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ, বাস্তুচ্যুত মানুষের ওপর প্রশাসনিক জুলুম ঘটনাস্থলে গিয়ে নিজে চোখে দেখে এসেছেন। সেসব ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখলেন জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে। এ যেন অমানবিকতার এক দলিল।

উমা

উৎস মানুষ-এর পুরনো পাতা থেকে

ধর্ম — আভরণ না আবরণ

নন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য

ধর্ম যেদিন ক্লান্ত হবে,
ব্যর্থ হবে সকল ভয়।
বুঝবে খিদে ভাতেই মেটে,
বাইবেল, কোরাণ, গীতায় নয়।।
—সংগৃহীত

মহাভারতে আছে, দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি শতপুত্রের জননী গান্ধারী পরম পতিব্রতা, ন্যায় ও সত্যানুসারিণী এক ধর্মপ্রাণা রমণী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, তাঁকে একদা স্বামী অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি দিবে তোমারে ধর্ম?' প্রত্যুত্তরে গান্ধারী বলেছিলেন, 'দুঃখ নব নব'। ধার্মিক ব্যক্তি ইহলৌকিক জীবনে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা শাসন-পীড়ন ভোগ করেও ধর্মের পথ থেকে স্খলিত হন না, সম্ভবত এই ধরনের উপলব্ধি গান্ধারীকে উল্লিখিত স্পর্ধিত ঘোষণায় উদ্দীপিত করেছিল। ধর্মের জন্য যে কোনও ত্যাগ এমন কি চন্দনকাষ্ঠের মতো ধীরে ধীরে আত্মবিলোপেও গান্ধারী পরাঙ্মুখ ছিলেন না। ধর্ম নিজেই যে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে অসংখ্য বিচ্যুতি এবং বিভ্রাটের কারণ এবং অশেষ দুঃখের প্রসূতি হতে পারে, তা এই মহিয়সীর কাছে স্বপ্নেরও অতীত ছিল বোধহয়। অবশ্য মহাভারতের দ্বাপর থেকে এখনকার 'কলিকাল'—সময়ের বিচারে কম দূর নয়!

শুরুতেই বলি, ধর্মের ভাববাদী সংজ্ঞার মাহাত্ম্য বিচার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, বাস্তবে ধর্ম কিভাবে আচরিত হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতেই কিছু নগ্ন সত্য তুলে ধরতে চাই। এই আলোচনায়, গভীর অরণ্যে বা গিরিকন্দরে না-দেখা অথচ হ্যাঁ-শোনা দীর্ঘায়ুযুক্ত সেই সব সাধকের কথার অবতারণা করছি না। ভক্ত রুইদাসের মতন যাঁরা বলেন, 'ভজন করবে মনে আর গৃহের কোণে' তাদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা ছাড়া আমার আর কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু সমাজে যাঁরা ধর্মের ধ্বজা ওড়ান, প্রয়োজনে শঠতা, নৃশংসতা ও প্রবঞ্চনায় পিছপা হন না, অজ্ঞ শোষিত দলিত মানুষের সেন্টিমেন্ট সুড়সুড়ি দেন এবং নিজেদের স্বার্থ ষোল আনা সুরক্ষিত রাখবার জন্য 'স্বর্গ থেকে নরক' তোলপাড়েও কসুর করেন না, তাঁদের দুর্দান্ত মহিমার কথঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দেওয়া হচ্ছে মাত্র।

ভারতবর্ষ মন্দির, মসজিদ এবং গীর্জা-র (যদিও সংখ্যায় কম) দেশ। এই সমস্ত ধর্মস্থানগুলিকে সমষ্টিগত ধর্মচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা যায়। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, এইসব ধর্মক্ষেত্রগুলির অধিকাংশের সামগ্রিক পরিবেশ রীতিমতো দূষিত ও ভয়াবহ। কোথাও নালা-নর্দমা, অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, কোথাও বাতাসে ধোঁয়া-ধূলিকণার আধিক্য। বছর দশেক আগে বৃন্দাবনের মন্দির দর্শন করতে গিয়ে মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর মল মাড়িয়ে যাওয়ার স্মৃতি এখনও আমার মনে মণিকোঠায় সজীব হয়ে আছে। মন্দিরের ভেতরের ভৌত পরিমণ্ডল অনেক সময় এমন আচ্ছন্ন থাকে যে, বিগ্রহের দিকে তাকাতেও কষ্ট হয়। দূষিত সামাজিক পরিবেশের কথা নাই বা তুললাম। তীর্থস্থান মানেই কাঙাল-ভিখিরির উপদ্রব---কেউ নুলো, কেউ অন্ধ, কেউ বা বধির, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তার উপর পাণ্ডা-পুরুতদের দুরন্ত টানা-হ্যাঁচড়া—কালীঘাট, তারকেশ্বর, পুরী, হৃষিকেশ, মাদুরাই সর্বত্রই সমান উৎপাত। গাঁটকাটা পকেটমারেরাও এখানে ভিড় করে, ভুক্তভোগীদের কথায় এর প্রমাণ মেলে। মন্দের ভাল, কর্তৃপক্ষের সতর্কীকরণসূচক বিজ্ঞপ্তি দেওয়ালে দেওয়া থাকে, যদিও পরিবেশ বিচারে তা বেমানান। যে-সমস্ত মন্দিরপ্রাঙ্গন অপেক্ষাকৃত নির্জন, সেখানে তাস-পাশার আড্ডা। ট্রানজিস্টরের গান, মাইকের কর্কশ আওয়াজে মনে হয় এগুলি হট্টমেলা বা মেছুয়াবাজার।

মঠ-মন্দির-সঙ্ঘগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনৈতিক পরিবেশ। লোকসমাজে একটা চালু শ্লোক আছে—রাঁঢ়, ষাঁড়, সন্ন্যাসী/এই তিন নিয়ে বারাণসী। শুধু বেনারস বা কাশীধাম নয়, অনেক জায়গাতেই ধর্মের নামে চলে উৎকট ভোগবিলাস, অনাচার এবং ব্যভিচার। দক্ষিণ ভারতের দেবদাসীদের দেহ বিক্রি তো ধর্ম-অনুমোদিত। প্রারম্ভ অনুষ্ঠানের দিন অক্ষতযোনি যে তরুণী পুরোহিতের অঙ্কশায়িনী হয় সারাজীবন সে জনপদবধূ হয়েই জীবন-যাপন করে। শিবের নামে দাগা ষাঁড়েরা নির্বিবাদে ঘুরে বেড়ায়, যেহেতু এদের বাঁধার নিয়ম নেই। গৃহস্থের বাড়িতে বেড়া

ভেঙে ঢুকে এরা কেবল হামলা বা আবাদী ফসল নষ্ট করে না, মাঝে মাঝে রাস্তা জুড়ে ট্রাফিক প্রবাহের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। সংসারে এই জীবগুলির একমাত্র উপযোগিতা বোধ হয় গাভীদের গর্ভবতী করা। তবে প্রকাশ্য দিবালোকে মৈথুনরত ষাঁড়কে দেখলে বালক-বালিকারা অপ্রস্তুত ও বিচলিত হয়, এই মাত্র। বিগত শতকে তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধব গিরির সাথে স্থানীয় নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী এলোকেশীর অবৈধ সম্পর্কের কাহিনী রগরগে বটতলার উপন্যাসকেও হার মানায়। সম্প্রতি কেরালায় এক যুবতীকে এক গীর্জার ফাদারের রিরংসার করুণ বলি হতে হয়েছে। সাধু-সন্তদের 'শান্ত' আশ্রমও এর ব্যতিক্রম নয়। ভক্তদের কাছে 'ভগবান' রজনীশ তো আবার 'ফ্রি সেক্স' তত্ত্বে বিশ্বাসী। নিন্দুকেরা বলেন, অবাধ যৌনসম্ভোগের সুযোগ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই দেশ-বিদেশের 'ধর্মভিক্ষু'রা এখানে আসেন এবং আস্তানা গাড়েন। কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হয়েছিল, রজনীশজী মারাত্মক এইডস রোগে আক্রান্ত। খবরটা যদি সত্য হয়, তবে ধর্মচর্চার প্রকরণ কি— সহজেই অনুমেয়।

আসলে আমাদের ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রে স্থূল অর্থোপার্জনের দিকটাই মুখ্য, অন্যসব গৌণ। পাণ্ডারা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা দর্শনার্থীদের মাথায় যে ডাণ্ডা মারে তার কারণ নাহলে নতুন যাত্রী আগমনে বিলম্ব হবে, এবং আরও প্রাপ্তিযোগ ঘটবে না। পুরোহিতরা নিজেদের ঈশ্বরের সেবক হিসাবে জাহির করে কিন্তু গরীব যাত্রীর সাথেও দক্ষিণা নিয়ে আলু-পটলের দর কষে। একই ডাব এবং বেল রিসাইক্লিং হচ্ছে, পূজাকালে তা আক্ছার দেখা যায়। কোনও কোনও জায়গায় পূজার উপচার সাজিয়ে রাখা দোকানদারের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে অকুস্থলে যাওয়া রীতিমতো শিরঃপীড়ার ব্যাপার। সুলতান মামুদ যে একাদশ শতকে মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, ধর্ম বিদ্বেষটা অজুহাত ছিল, অর্থলোলুপতাই ছিল মূল কারণ। শহর বাজারে দেবদেবীর যে 'ঠেক'গুলো গড়ে উঠছে সেগুলিও ভাগ্যান্বেষীদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। সংগৃহীত খুচরো পয়সায় সাট্টার কারবার ভালোই চলে।

ধর্মাচরণের সাথে জনস্বাস্থ্যের প্রশ্ন জড়িত। শাস্ত্রে আছে গঙ্গাস্নানে ত্রিপাপ দূরীভূত হয়, চতুর্বর্গ মুক্তিলাভ ঘটে। কিন্তু যে হারে তীরবর্তী শহরের নর্দমা আর কলকারখানার আবর্জনা গঙ্গায় মিশছে তাতে গঙ্গাকে পুণ্যতোয়া বলা যায় না। দূষিত জল ব্যবহারে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা সেন্ট পারসেন্ট। কেরালার গুরুভায়ুরে যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি আছে তা দর্শন করতে গেলে প্যান্ট-শার্ট পরা বারণ। এজন্য ধুতি ভাড়ায় খাটানো হয়। একই ধুতি সহস্রজন পরিধান করে। এই ধরনের ক্ষতিকর স্বাস্থ্যবিধি বহির্ভূত সংস্কারের পেছনে যুক্তি কি? কেরলের শিক্ষিত সমাজও এই ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ আজও করতে সমর্থ হন নি।

ধর্ম মানুষের অসহায়তাকে মূলধন করে দিব্য পসার জমায়। ঠাকুর ঘরের নতুন দেবী সন্তোষী মায়ের কথা ধরা যাক। ১৯৫০ সাল নাগাদ আবির্ভূত হয়ে ভক্তমনোভূমে জেঁকে বসলেন, তার কারণ তিনি বেকারিত্ব ঘোচান। গোলোকপতি আচার্য্যের লেখা পাঁচালীতে আছে— ছোটপুত্র রাম তার বেকার জীবন/না পারে করতে কিছু অর্থ উপার্জন।/ বেকার জীবনে কেহ না পায় আদর/তাই অতি দুঃখে রয় তাহার অন্তর।

ধনের জন্য আছে লক্ষ্মী, বিদ্যার জন্যে সরস্বতী, সর্পভয় নিবারণে মনসা, বসন্তের রোগ নিকাশে শীতলা। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর ভারতে জ্বলন্ত বেকার সমস্যা থেকে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মুক্তি দেবেন কে? পোস্টকার্ডের মাধ্যমে দেবী মহিমা প্রচারের এক অদ্ভুত কৌশল চোখে পড়ে। যে সহযোগিতা না করবে তার চরম সর্বনাশ হবে। এরকম হুমকি দেওয়া হয়। ভক্তিতে নয়, ভয়ে লোকে পাঁচালী ও ব্রতকথা কেনে, প্রকাশকের লাভ হয়। বিজ্ঞানী থমাস আলভা এডিসন এই কারণে মন্তব্য করেছেন — So far as religion of the day is concerned, it is a damned fake ...Religion is all bunk.

একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ধর্মীয় বিশ্বাস বা সংস্কার মানুষের স্বাভাবিক যুক্তি বা বিচার ক্ষমতাকে পঙ্গু করে ফেলে। মিশনারি স্কুলে নীতি-বিজ্ঞানের বই খুলে যীশুখ্রীস্টের গুণকীর্তন, স্কুল-কলেজে সরস্বতী পূজায় বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায়, ওয়ার্কশপগুলিতে বিশ্বকর্মা পূজার আয়োজন গড্ডালিকা প্রবাহের অঙ্গ। এতে সমঝোতা করার মানসিকতা গড়ে ওঠে, চ্যালেঞ্জ জানানোর ইচ্ছা জাগ্রত হয় না? পি বি শেলির ভাষায় — The crime of enquiry is one which religion has never forgiven. ধর্ম মানবতা বিরোধীও। ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিষিদ্ধ করেন। দেড়'শ বছরের অধিক পুরাতন আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে রাজস্থানের দেওরালা গ্রামে রূপ কানোয়ারকে পুড়িয়ে মারা হল। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সতীমেলায় নামী-দামি লোকেরা দর্শন দিলেন। পুলিশ নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নিল। এখনো বিহার-মধ্যপ্রদেশ-গুজরাটে উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের মানুষদের ছায়া মাড়ান না, অস্পৃশ্যতা বা ভেদবুদ্ধি এত প্রবল যে একই কুয়োর জল

ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। হরিজনরা গলায় ঘণ্টা বেঁধে ঘোরেন যাতে শব্দে উচ্চবর্ণের মানুষ পূর্বাহ্নে সতর্ক হন। জোনাথন সুইফট্ যথার্থই বলেছেন ঃWe have enough religion to make us hate but not enough to make us love one another.

ধর্মের সাথে রাজনীতির সংস্রব চিরদিনের কিন্তু ইদানীংকালে তা নগ্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। শিখদের খালিস্তান দাবি, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা, ইরানে মৌলবাদীদের ক্ষমতা গ্রহণ, আফগানিস্তানে মুজাহিদদের সংগ্রাম সবই এক ইঙ্গিত দেয়। রাম জনমভূমি বা বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি, মুসলিম লীগ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ ঐ সমস্ত সংস্থার জন্ম মৌলবাদের গর্ভেই। দুর্গাপূজা, উরস্উৎসব প্রভৃতি পালন করার জন্য গঠিত কমিটিতে পদগ্রহণের জন্য হৈ-হুল্লোড়, সারা রাত মাইকের তীক্ষ্ণ চিৎকার, প্রতিমা বিসর্জনের সময় কদর্য অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি হয় তবে দোষ কার? এটা অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ যে, আমাদের রাজনীতিবিদরা সত্যকার সেকুলার ভাবাদর্শ অনুসরণ করেন না। তাই দেখি 'হাই-টেক' প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর শেষে বিমান বন্দরে নেমে কুলপুরোহিতের তিলক কপালে লেপেন, সূতমালা ধারণ করেন। তিনিই আবার বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণে গিয়ে মন্দিরে পুজো দেন, মঠের স্বামীজীদের সাথে সাদর সম্ভাষণ করেন। পুরোহিত না হয় ভাগ্যান্বেষী, শঙ্করাচার্য না হয় ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু। কিন্তু একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক 'সমাজবাদী' রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর এ কিরূপ আচরণ? সে কি কেবল ধর্মান্ধ হিন্দুদের তুষ্ট করার জন্য? ইনিই আবার মুসলিম বিল চালু করে মৌলবাদী মৌলবীদের তোয়াজ করেন। রাজ্যের মুখমন্ত্রী, মন্ত্রী বা পদস্থ আমলাদের অবস্থা তথৈবচ। হরিদেও যোশী খরা রুখতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। খোদ দিল্লীর বুকে অন্যের সন্তানকে বলি দিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনের মতো ঘটনা আজও ঘটে। পুলিশ এসব ব্যাপারে নির্বিকার, যদিও হরিজন ও দলিতরা নাথ দ্বারা মন্দিরে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে যখন মিছিল করে তখন তারা রণসাজে তৎপর হয়।

ধর্মকে কেন্দ্র করে আইন-শৃঙ্খলার অবনতিও হচ্ছে। কর্ণাটকের মালানাড় অঞ্চলের অজ পাড়াগাঁ চণ্ডগুত্তিতে এক মেলা হয়। ঐ স্থান থেকে ৪ কিমি দূরে বরদা নদী, এর জলে অবগাহন করে স্ত্রী-পুরুষ মানতকারীরা সম্পূর্ণ নগ্নবেশে হেঁটে চণ্ডগুত্তিতে দেবী মাতঙ্গীর কাছে পুজো দিতে আসেন। যেহেতু নারীরা সংখ্যায় অধিক, তাদের নগ্ন সৌন্দর্যের বিকৃত উপভোগের জন্য দর্শক, সমাজবিরোধী, ইভ-টিজারদের ভিড় হয় প্রচুর। মাঝে মাঝেই হাঙ্গামা, অঘটন ঘটে। স্বেচ্ছাসেবীরা এই কুপ্রথার বিরোধিতা করতে গেলে হেনস্তা হয়। ১৯৮৬ সালে শিমোগা জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার তার কয়েকজন মহিলা পুলিশ নিয়ে বাধা দিতে গিয়েছিলেন। তাদেরও উলঙ্গ করে একদল ক্ষমতাবান দৌরাত্মকারী হাঁটতে বাধ্য করে, 'বেত্তেলে সেভে বেকুবেকু' (নগ্নপূজা চলুক, আমরা চাই—এইরকম শ্লোগানে চারদিক মুখর করে তোলে। তারকেশ্বরের পদযাত্রীদের বিরাট অংশ বিনা টিকিটে যান। তাদের বাঁক এবং ভাঁড়ের ঠেলায় সহযাত্রীদের অতিষ্ঠ হতে হয়। আজকাল 'ভোলে বাবা পার করে গা' শ্লোগান কম শোনা যায়। 'বাবা'র শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে এমন সব খিস্তি-খেউড় বর্ধিত হয় যেন মনে হয় কানে গরম সীসা পড়ছে। ভক্তদের জন্য নির্মিত অস্থায়ী শিবিরগুলিতে উচ্চগ্রামে মাইক বাজে, জুয়ার আসর বসে। ওহ্, হাঁটার পরিশ্রম অপনোদনের জন্য কি রুচিপূর্ণ ধর্মসম্মত ব্যবস্থা? প্রতিবাদ করার দুঃসাহস কেউ দেখান না। এদের কথা ভেবেই না Francesco Guicciardini সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেনঃNever wage war on religion, nor upon seemingly holy institutions, for this thing has too great a force upon the minds of fools.

ধর্মীয় নেতারা প্রায়ই প্রচার করেন, ধর্মের অধিকার মৌলিক অধিকার। ইচ্ছাকৃতভাবে তারা চেপে যান যে, এই অধিকার নিরঙ্কুশ নয়। ২৫ নম্বর ধারায় আছে, ভারতের যে কেউ তার পছন্দমতো ধর্মাভ্যাস করতে পারেন, ধর্ম সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্ত করতে পারেন এবং তা প্রচার করতে পারেন যদি না তাতে জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। সমাজকল্যাণ সমাজসংস্কারের স্বার্থে এবং ধর্মীয় অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত কোনও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা কোনও ধর্মনিরপেক্ষ কাজ কারবার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা থেকে এই অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রকে বিরত করতে পারে না। ১৯৬২ সালে সুপ্রিম কোর্ট সৈফুদ্দিন বনাম বোম্বাই রাজ্য মামলায় এ প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট রায় দেন। ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদে আছে ধর্মের ব্যাপারে কাজ পরিচালনা করার পুরো অধিকার রয়েছে যে কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠী, সঙ্ঘ বা সংগঠনের। এই অধিকার একই শর্ত সাপেক্ষ। ১৯৫৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট মোতিদাস বনাম শাহী মামলার ঐ শর্তের আইনগত দিক খতিয়ে দেখেন।

কার্ল মার্কস্ অনেক দিন আগেই ধর্মের অবক্ষয় দেখতে

পেয়েছিলেন। তিনি দৃঢ় আহ্বান জানিয়েছেন ঃ The imaginary flowers of religion adorn man's chains. Man must throw off the flowers and also the chains. ধর্মকে শাসকেরা শোষণ ও স্থিবস্থা বজায় রাখার কাজে লাগায়। ধর্মের নামে মুরুব্বি বা মাতব্বরেরা যেসব নীতিকথা বলেন তা নিজেরা মানেন না, যা করেন তার সাথে ধর্মের লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। ধর্ম নিয়ে যত লেখা-লেখি, লড়াই এবং রক্তপাত সব এক ধরনের উন্মত্ততা বা একদেশদর্শিতা ছাড়া কিছুই নয়। ধর্মের লক্ষ্য যদি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে পূর্ণতা আনয়ন, মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ এবং সমস্ত রকমের অসাম্য, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার অবসান হয়, তবে তা কখনও চরিতার্থ হবে না কারণ আমরা সেই ধর্মের জন্য বাঁচি না। চার্লস্ কল্টন যখন বলেন --- ''Men will wrangle for religion; write for it; fight for it; die for it; anything but-live for it" তখন প্রচণ্ড ক্ষোভই ঝরে পড়ে। সিনেকার কথাটাই মনের মধ্যে অনুরণিত হতে থাকে ঃ Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false and by the rulers as useful. [ধর্ম সাধারণ মানুষের কাছে মহান সত্য, পরমার্থ; সচেতন জ্ঞানী মানুষের কাছে মিথ্যাচার; শাসককুলের কাছে প্রয়োজনীয় কৌশল মাত্র।]

সূত্রঃ India Today/ Illustrated Weekly/ আনন্দবাজার পত্রিকা/ উৎস মানুষ

যুগ্ম সংখ্যা অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮৮
উমা

আহরণ

কেন ঈশ্বর মানি না

শেখর চট্টোপাধ্যায়

আমি সেই ছেলেবেলা থেকেই যে কোন কারণেই হোক ঈশ্বর বিশ্বাস করি না। ধর্ম আমাকে কোনভাবেই নাড়া দেয় না বরং বরাবরই আমার মনে হয়েছে এটা একটা কুসংস্কার। বিশেষ করে ছেচল্লিশের দাঙ্গা দেখার পর থেকে আমি ধর্মকে ঘৃণা করি। কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে যাই। আমার কাছে ধর্মের অজুহাতে কেউ এলে তাঁকে করজোড়ে বলি, আপনি আমার বাড়িতে আসবেন না, ধর্মের কথা বলবেন না।

আজকের দিনে আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় ক্ষতি করছে ধর্ম। ধর্মের জন্য সারা দেশটা টুকরো টুকরো হতে চলেছে। ধর্মের অজুহাতে আজ পাঞ্জাবে চলেছে বিচ্ছিন্নতাবাদ। আজ তাই একটা প্রশ্ন সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে, ভারতকে যদি অবিচ্ছিন্ন রাখতে হয় তাহলে প্রকাশ্যভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে একেবারে আইন করে বন্ধ করতে হবে।

ধর্ম তো ঐ ঈশ্বরকেই কেন্দ্র করে। ঈশ্বরকে মানা, না-মানা প্রসঙ্গে আমার সবচেয়ে প্রিয় নাট্যকার বের্শট্-এর একটা উক্তি বারবার মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, যে লোক বলেন যে ঈশ্বর আছে, আমি তাঁর মাথাটা পাথর দিয়ে মেরে ভেঙে দিতে চাই। কারণ, ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে এটা কেমন করে হয় যে, যাঁরা সৎলোক তাঁরাই শুধু কষ্ট পান, আর যারা অসৎ তারা সুখে থাকে? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

এটা আমারও প্রশ্ন। আজ সত্যিই ধর্ম নিয়ে এক অদ্ভুত অবস্থা চলছে। এই কলকাতাতেই আমরা আজ দেখি ধর্মের উৎসব, পরব, পার্বণ প্রায় প্রতিনিয়ত লেগে আছে। দুর্গাপুজোই বলুন, কালীপুজোই বলুন বা অন্য যে কোন পুজোই বলুন, এই সময় কোন ভদ্রলোক বাড়িতে থাকতে পারেন না। প্রত্যেকটা পুজোতেই চলে অত্যাচার, চাঁদার জুলুম আর সেই পুজো প্যান্ডেলে যে অপ-সংস্কৃতি ও রুচির পরিচয় পাই সেগুলো কিন্তু ধর্মের আড়ালে বেশ চলে যাচ্ছে। এতে সমাজে এক বিরাট অবক্ষয় ঘটছে। আমি মনে করি এই পুজো বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কোনও প্রকাশ্য মণ্ডপে পুজো করা চলবে না। সকলের বোঝা উচিত ঈশ্বর একান্ত আপন ব্যাপার। বিশ্বাস করতে হয় করুন, নিজের মনে মনে করুন, নিজের ঘরে বসে করুন। কিন্তু বাইরে তাকে প্রকাশ করতে দেওয়া হবে না, আমাদের দেশে এটা এখনই দরকার। কারণ এখানে অশিক্ষার হার অনেক বেশি। ভারতের লোক ধর্মান্ধ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। খুবই আশ্চর্যের কথা, বিজ্ঞানের অগ্রগতি যত দ্রুততর হচ্ছে, আমরা, ভারতবাসীরা কিন্তু পিছিয়েই থাকছি। ঈশ্বর বলে যে কিছু নেই সেটা বিজ্ঞান একের পর এক প্রমাণ করে দিচ্ছে। আমার বক্তব্য, ঈশ্বর না থাকলে আমাদের কোনও ক্ষতি নেই। থাকলেও কোনও লাভ নেই। চার্লস চ্যাপলিনের ভাষায় বলতে চাই, ঈশ্বর থাকুন আমার তাতে কোন আপত্তি নেই; কারণ ঈশ্বরের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই এবং কোন সদ্ভাবও নেই। ঈশ্বরের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নেই।

আমি মনে করি ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষের যতদিন থাকবে ততদিন কিন্তু সমাজের কোনও শান্তি হবে না, কোনও উন্নতি হবে না। আজ ভারতবর্ষে যে কোন কাজই করা যাচ্ছে না তা ঐ ঈশ্বর তথা ধর্মের জন্য। আমি এমন অনেক ঘটনা জানি, যেখানে হয়তো একটা সেতু তৈরি হবে—সেখানে একটা দল এসে বলল, এখানে কালীমন্দির হবে। ঝগড়া, মারপিট, অবশেষে মামলা হলো। সেতুর কাজ আটকে গেল। সমাজের অগ্রগতিকে এইভাবে ব্যাহত করছে 'ঈশ্বরবাদ'। তাই ঈশ্বরকে সযত্নে মানুষের কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখতে হবে। আমি বলছি না যে, মন থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু মন থেকে না সরালে আবার কর্মক্ষেত্র থেকে সরানো মুস্কিল। ইওরোপের মত ধনতান্ত্রিক দেশেও ঈশ্বরকে মানুষের মন থেকে সরানো যায়নি। কিন্তু সেখানে যেহেতু শিক্ষার হার খুবই ব্যাপক, তাই তাঁরা ঈশ্বরকে এমন একটা জায়গায় রাখেন যেটা সমাজের উন্নতিতে ব্যাঘাত করতে পারে না।

যেখানে বিজ্ঞানের কথা, মানুষের কল্যাণের কথা, সেখানে তাঁরা ঈশ্বরকে প্রতিবন্ধক হতে দেন না। কিন্তু আমাদের দেশে ঈশ্বরকে ব্যবহার করছে কিছু ধান্দাবাজ লোক, মুনাফাখোর, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকরা ও রাজনীতিকরা। সবাইকে তাই আজ চিৎকার করে বলতে হবে ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর থাকলে মানুষকে বিনা চিকিৎসায়, বিনা আহারে, বিনা পথ্যে বিনা বস্ত্রে মরতে হতো না। দূরে যেতে হবে না, কলকাতাতেই বহু জায়গায় যে অসংখ্য বস্তি আছে সেখানে মানুষ যেভাবে বাস করে, যেভাবে সন্তান জন্ম নেয়, সেগুলো দেখে কোনও সভ্য লোক চোখ খুলে থাকতে পারেন না। সেখানে মানুষ, কুকুর, মোষ সব একসঙ্গে থাকে। প্রতি বছর বন্যার সময় সে কি অবর্ণনীয় দৃশ্য; কিন্তু এখানে এত কষ্ট করেও লোকে ভাবে এসব ঈশ্বর করছেন, বিজ্ঞান তাদের কাছে অজানা। তারা দাবী করতে জানে না। মানুষ চাঁদে গিয়ে হেঁটে আসার পরও বহু শিক্ষিত লোক এখনো বিশ্বাস করেন, রাহু গ্রাস করে বলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। তাঁরা লাইন বেঁধে গঙ্গাস্নান করতে যান। এক সময় ভাবা হতো স্পেস বা মহাকাশ না কি ঈশ্বরের রাজত্ব। এখানে বিজ্ঞান পৌঁছুতে পারবে না। কিন্তু সে মহাকাশই তো মানুষ পাড়ি দিল। তাই ঈশ্বরে বিশ্বাস যে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক তা নয়, এটা বিজ্ঞান বিমুখী।

আসলে ঈশ্বরকে খাড়া করে কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ শাসক শ্রেণী অশিক্ষিত, সরল ও মানসিক দিক থেকে দুর্বল লোকদের শোষণ করছে। এরা মুনাফাখোর, এরা ওষুধে, খাবারে ভেজাল মেশায়। কিন্তু তারা দিব্যি টাকার গদিতে শুয়ে আরামে আছে আর যারা রোজ পুজো করছেন, মানত, ব্রত ইত্যাদি করছেন, বাঁক নিয়ে তারকেশ্বর যাচ্ছেন তাঁরা ধুঁকছেন। এর থেকে বড় প্রমাণ আর কীই বা হতে পারে যে, ঈশ্বর নেই।

সব মিলিয়ে সব কিছুতেই আমি দেখি যে ঈশ্বর নানাভাবে আমাদের ক্ষতি করছেন। শুধু অশিক্ষিত কেন, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও দেখি অনেকেই ঈশ্বর মানেন। আবার এঁরা রাজনৈতিক মিছিলে যান, মিটিংও করেন, ভোটও দেন। এখানে কারণটা অক্ষমতার প্রশ্ন। নিজেদের মানসিক দুর্বলতাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের আড়ালে।

এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আজকাল গুরুবাদটা খুবই বেড়ে যাচ্ছে, এটা বন্ধ হওয়া উচিত। গুরু অলৌকিক কিছু করতে পারেন এই বিশ্বাস শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও এসে পড়েছে। অনেকেই জানেন কোনও এক বিশেষ গুরু এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে কলকাতার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তরুণ এক যাদুকরের সামনে কেমন বে-কায়দায় পড়েছিলেন। ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা গবেষণা শাখা আছে যেখানে এই অলৌকিক-এর সম্বন্ধে রিসার্চ চালানো হচ্ছে। এই গুরুবাদটাও বিজ্ঞান বিরোধী ব্যাপার। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে যা কিছু প্রতিবন্ধক সব কিছুকেই সরিয়ে দিতে হবে। ঈশ্বরের একমাত্র বিকল্প বিজ্ঞান।

এই নিবন্ধটি বিবেক গুহ সম্পাদিত 'শেখর চট্টোপাধ্যায়ঃ জীবন ও নাট্যভাবনা' বই থেকে নেওয়া। যুগান্তর পত্রিকায় ২৯.৭.৮৭ তারিখে প্রকাশিত।

উমা

অনুমতি ব্যতিরেকে এই বই-এর কোনো অংশের মুদ্রণ ও প্রতিলিপিকরণ আইন অনুযায়ী করা যাবে না।

— সম্পাদকমণ্ডলী

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়োদশ স্মারক বক্তৃতা

বিজ্ঞানীর নীতিবোধ ও ভারতীয় জ্ঞানধারা

রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এক জায়গায় বলেছেন, ''জ্ঞান কখনোই একটি বিশেষ জাতির একচেটিয়া অধিকার নয়। সমগ্র বিশ্ব আত্মনির্ভরশীল এবং সম্মিলিত চিন্তাধারায় যুগে যুগে মানবজাতির সাধারণ ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।'' তিনি যে প্রসঙ্গেই কথাটা বলুন, বর্তমান পরিস্থিতিতে কথাটা বারবার উল্লেখ করতে ইচ্ছে করে। কারণ যে দুটি আপাত নিঃসম্পর্কিত বিষয়কে এই লেখার শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যেকার সম্পর্কটি স্পষ্ট করে তুলতে এই উক্তিটি খুবই কার্যকরী।

সত্যি বলতে কি সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানীদের অবস্থান খুব একটা উচ্চকিত নয়; দু-একটি ঘটনায় কিছুটা নাটকীয়ভাবে তাঁরা আলোচনায় উঠে আসেন। যেমন কয়েকমাস আগে চন্দ্রযান ও সূর্যযানের সাফল্য; তার আগে করোনা মহামারী পর্বে টিকার আবিষ্কার। তেমনি বিজ্ঞানীর নীতিবোধ বিষয়টিও বিচিত্র কারণে মাঝেমধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে একটা আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। যেমন ওপেনহাইমার ছবির সূত্র ধরে পরমাণু বোমা বানাবার পেছনে বিজ্ঞানীদের কতটা নীতিবোধের অভাব ছিল, সেটা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু সুইচ টিপে আলো-পাখা চালানো থেকে বোতাম টিপে কম্পিউটার চালানো অবধি সব কিছুর পেছনেই যে কোথাও না কোথাও বিজ্ঞানীরা আছেন, এটা সাধারণ মানুষের খেয়াল থাকে না আর তাই বিজ্ঞানীর নীতিবোধের/অভাবের কারণে কোথায় কি লাভ/ক্ষতি হচ্ছে তাও খুব কম সময়েই ধরা পড়ে। তাই ভারতীয় জ্ঞানধারার চর্চা, যা আসলে প্রাচীন ভারতে ঐতিহ্য ও গৌরবকে তুলে ধরবে বলে আশা করা হচ্ছে, তার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের নীতিবোধের যোগাযোগ কোথায় তাও প্রাথমিকভাবে বুঝে ওঠা কঠিন।

ভারতীয় জ্ঞানধারা কি ও কেন!

সেটা বুঝতে গেলে ভারতীয় জ্ঞানধারা বা Indian Knowledge System (IKS) বিষয়টা জেনে নেওয়া দরকার। বিষয়টির গোড়াপত্তন হয়েছিল ২০১৪ সালে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সময় থেকেই। তার ঠিক পর থেকেই বিভিন্ন সভা-সমিতিতে, যেমন 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস'-এর বার্ষিক অধিবেশনে, আই আই টি-র সম্মেলনে নানারকম পৌরাণিক ঘটনাকে সত্যি বলে দাবি করা শুরু হয়। গণেশের শরীরে হাতির মাথাকে প্লাস্টিক সার্জারির উদাহরণ, গান্ধারির শত পুত্রের জন্মকে স্টেম সেল প্রযুক্তির উদাহরণ, পুষ্পক রথকে বিমান ইত্যাদি বলে দাবি করে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে নানারকম অতিরঞ্জিত ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা শুরু হয়। ২০২০ সালে নতুন করোনা পর্বের মধ্যেই সম্পূর্ণ অ-গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন হয়। তারপর থেকে ব্যাপারটার গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে গেছে; কারণ প্রণেতাদের ভাষায় এই শিক্ষানীতি হল 'প্রাচীন ও সনাতন ভারতবর্ষের সমৃদ্ধশালী জ্ঞান ও পরম্পরার আলোয় আলোকিত' এবং এই জ্ঞানকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুনভাবে আবিষ্কার করা হল এই শিক্ষানীতির একটা উদ্দেশ্য। অবিলম্বেই এই উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের কারিগরি শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত সংস্থা এ আই সি টি ই-র তত্ত্বাবধানে ভারতীয় জ্ঞানধারার চর্চার ওপরে একটি বিশেষ সেল চালু হয়, বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার শাখা খোলা হয় এবং IKS-এর ওপর গবেষণা বাধ্যতামূলক করে তোলা হয়। অতঃপর সরকারিভাবেই মহাসমারোহে ভারতের কাল্পনিক গৌরবময় অতীতকে তুলে ধরতে অতিসক্রিয়তা

শুরু হয়ে যায়, প্রায় রোজই যার নতুন নতুন নমুনা পেশ হচ্ছে।

গত তিন বছর ধরে (২০২১-২০২৩) খড়গপুর আই আই টি-র বার্ষিক ক্যালেন্ডারে চোখ রাখলেই ব্যাপারটা অনেকটা বোঝা যাবে। ২০২১ সালে গোটা বছর (১২ মাস) ধরে ক্যালেন্ডারের পাতায় পাতায় প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা, যেমন 'অর্থশাস্ত্র' 'রসায়ন' 'গণিত ও জ্যামিতি', ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদি কতটা উন্নত ছিল সেকথা বিভিন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কথা উদ্ধৃত করে প্রতিষ্ঠা করা হল, এবং সংস্কৃত ভাষার মাহাত্ম্যও প্রচার করা হল। ২০২২ সালে বারোটি মাস ধরে নানারকম চিহ্ন (স্বস্তিকা, চক্র, তীর)বিশ্লেষণ করে আর্য সভ্যতাই যে প্রাচীনতম এবং যাবতীয় জ্ঞানের আধার সেটা প্রমাণ করা হল। ২০২৩ সালে সরাসরি ভারতবর্ষকে 'বিশ্বগুরু' হিসেবে তুলে ধরার জন্য আইনস্টাইন, হাইসেনবার্গ, নিকোলা টেসলা ইত্যাদি প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের নানারকম উদ্ধৃতি তুলে ধরতে জিন-প্রযুক্তি, কোয়ান্টাম তত্ত্ব, তাপগতিবিদ্যা, সকলই যে প্রাচীন (আর্য) ভারতের থেকে উদ্ভুত, সেকথা প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রাণ ও আকাশ শব্দ দুটি যে আসলে বল ও বস্তুর ধারণার সমার্থক, কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে অনুলোম-বিলোমের মিল রয়েছে, হাইসেনবার্গ যে রবীন্দ্রনাথকে প্রায় গুরু মেনেছিলেন, এইসব কথাও সেখানে সোচ্চারে ঘোষণা হয়েছে। ২০২৪-এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রীতিমতো রোমাঞ্চ হচ্ছে যে এর পর কি দেখব! ভাবতে ভাবতেই হাতে এসে গেল ২০২৪ সালের ক্যালেন্ডার। এবার ব্যাপার আরো গোলমেলে আর বাঁধন আরো শক্ত। ভারতবর্ষই যে দর্শন থেকে বিজ্ঞান যাবতীয় জ্ঞানের উৎস, মহামুনি কপিলই যে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে বিবর্তনবাদ অবধি যাবতীয় জ্ঞানের আধার, সংস্কৃতই যে সব ভাষার জননী (মহাজাগতিক ভাষা) ইত্যাদি ধারণাকে নানারকম প্রতিশব্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে শুধু এই ক্যালেন্ডারটি নিয়েই পাতার পর পাতা লেখা যায়।

এছাড়াও বিষয় আছে যেগুলো শুধু ভ্রান্তই নয়, হাস্যকরও বটে! যেমন আই আই টি গৌহাটিতে 'গো-বিজ্ঞান' (Cow-Science) নিয়ে আলোচনাচক্র আহ্বান করা হচ্ছে (মে, ২০২৩); সেখানে 'ভারতীয় গোরু'র বৈশিষ্ট্য, ধর্ম-সাহিত্যে তার অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে গবেষণাপত্র চাওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্যালেন্ডারে ভারতীয় জ্যোতিষের (জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়!) গুণগান গাওয়া হচ্ছে, স্থাপত্যবিভাগের অধ্যাপক ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রের জয়গান গাইছেন। এইমস্-এর ডাক্তার এবং একটি বিভাগের প্রধান 'গর্ভসংস্কার' (মানে সন্তানসম্ভবা নারীর নানারকম ধর্মাচরণ, যাতে সুস্থ সন্তান জন্মে)-এর সপক্ষে জোরালো সওয়াল করছেন ইত্যাদি। পঞ্চগব্যের উপকারিতা (২০১৬, আই আই টি, দিল্লি), বৈদিক যুগের বিমান যা গ্রহান্তরে পাড়ি দিতে পারে (জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ২০১৫), গো-মূত্র পানে করোনা থেকে ক্যান্সার সব সেরে যাওয়ার দাবি, প্রাচীন ভারতে দূরদর্শন, আন্তর্জালের অস্তিত্ব (মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা)—এ সবই তালিকার উজ্জ্বল সংযোজন।

তবে এখানেই শেষ নয়, আই কে এস বিষয়ে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে তা নিয়ে সম্প্রতি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার চূড়ান্ত নির্দেশিকাও প্রকাশ করেছে মঞ্জুরি কমিশন। নির্দেশিকা অনুযায়ী ছাত্রদের গণিতের সঙ্গে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, জীবপদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে আয়ুর্বেদ, চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গেও আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি ইত্যাদি পড়াতে হবে, এইসব বিষয় সংক্রান্ত ঐচ্ছিক পাঠক্রম নিতে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষকদের এইসব বিষয়ের ওপর 'রিফ্রেশার্স কোর্স' করতে হবে যাতে তাঁরা আই কে এস-এর ওপর নথি, ভিডিও এবং বক্তৃতা প্রস্তুত করতে নিপুণ হয়ে ওঠেন। ভারতীয় জ্ঞানধারার ওপরে গবেষণা প্রকল্প চেয়ে বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে, এমনকি বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এই সব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত শিরোনাম দিয়ে অনুদানের জন্য আবেদন করতে। যেমন, সমুদ্রবিজ্ঞানের ওপর গবেষণা প্রকল্পের শিরোনামে যেন 'সমুদ্রমন্থন' কথাটি থাকে, পুষ্টিবিজ্ঞানের প্রকল্প যেন প্রাচীন ভারতের খাদ্য ও তার পুষ্টিগুণ নিয়ে কিছু আলোকপাত করে ইত্যাদি। আরো আছে। আয়ুর্বেদকে চিকিৎসার একটি শাখা হিসেবে পড়ানো হয়, সে একরকম। কিন্তু সম্প্রতি এই শাখায় 'চিকিৎসা-জ্যোতিষ' (মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি) নামক একটি বিষয় ঢোকাবার চেষ্টা হচ্ছে, যেখানে ১০ মাসের একটি কার্যক্রমের মাধ্যমে পেটের অসুখ, হার্টের অসুখ, যক্ষ্মা, জ্বর ইত্যাদি বিভিন্ন অসুখের সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্র-জন্মছকের যোগাযোগ এবং নিরাময়ের উপায় 'শেখানো' হয়েছে। ভারতীয় সমাজে মনুস্মৃতির প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে গবেষণা প্রকল্পে ছাত্র চেয়ে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ হয়েছে আই আই টি মান্ডি-র চত্বরে। আর বেদ-পুরাণ-ভগবদ্গীতা বিষয়ক ক্যুইজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে আই আই টি শিবপুরে। দিনক্ষণ বিচার করে উপগ্রহ ছাড়া আর যাগযজ্ঞ করে বিজ্ঞানভবনের

উদ্বোধন তো অনেক পুরনো ব্যাপার। সুতরাং বলা যায় বিজ্ঞানকে বৈদিক যুগে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে মেলানো হচ্ছে যাবতীয় বুজরুকির সঙ্গে, যেটা খুবই গোলমেলে অবস্থান। তবে বিষয়টি সুপরিকল্পিত এবং পারম্পর্য একেবারে পরিষ্কার। ২০১৪ সালে যে সাংসদ জ্যোতিষ শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক যথার্থতা দাবি করেছিলেন, তিনিই পরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নেরক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তাই ২০১৪ থেকে ২০১৯ অবধি ক্রমাগত ছড়িয়ে যাওয়া মণিমুক্তোগুলোকে এবার যে পাকাপোক্তভাবে গেঁথে ফেলা হবে সেটা প্রত্যাশিতই ছিল, আর তাই হচ্ছে।

ভারতীয় জ্ঞানধারার বিপক্ষে ঃ নট ইন মাই নেম!

মাতৃভূমির প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার গুরুত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি নেই। কিন্তু তার নাম করে মিথ্যে কথা ছড়ানো অন্যায়। আর বিষয়টা স্পর্শকাতর বলে তার সূত্র ধরে সাধারণ মানুষকে মাতিয়ে তোলাও সহজ। এক একটা মিথ্যে কথা বারবার শুনতে শুনতে সত্যি হয়ে ওঠে। আর এখানে তো মিথ্যে কথা অনেকগুলো। তাই বারবারই তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে হয়। প্রথমত, ভারতীয় জ্ঞানধারার নাম করে যেসব কথা ছড়ানো হচ্ছে তাদের যে কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বা প্রমাণ তো নেই-ই, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও নেই। অর্থাৎ উন্নত মানের ক্ষেপণাস্ত্র বা বিমানের ভাঙা টুকরো ইত্যাদি যেসব প্রমাণ থেকে ইতিহাস গড়ে তোলা হয় সেসব কিছু পাওয়া যায় নি। সবটাই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী থেকে কল্পনা করে নেওয়া। তাকে প্রামাণ্য বলে ধরলে তো 'সময় অভিযান' (টাইম ট্রাভেল) আর তারকা যুদ্ধ (স্টার-ওয়ার) এমনকি হাল আমালের ঝাঁটা-সফর (হ্যারি পটার)কেও সত্যি বলে ধরে নিতে হয়।

দ্বিতীয়ত, ভারতের ইতিহাসকে সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক যুগ, বৈদিকোত্তর যুগ, ইসলাম যুগ এবং ইসলাম পরবর্তী আধুনিক যুগ এইভাবে ভাগ করা হলেও জ্ঞানধারার হিসেবে প্রাচীন ভারত বলতে শুধুমাত্র বৈদিক যুগকেই প্রচার করা হচ্ছে। যাবতীয় বৈজ্ঞানিক প্রমাণকে (যেমন রেডিও-কার্বন ডেটিং) গোল্লায় পাঠিয়ে সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শনকে ইচ্ছেমতো গিলে ফেলা অথবা অস্বীকার করা হচ্ছে। প্রয়োজনে বৈদিক যুগের সময়কাল দশ হাজার বছর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া (আসলে মাত্রই খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ পর্যন্ত) হচ্ছে, যাতে উন্নতির যাবতীয় চিহ্নগুলোকে বৈদিক যুগের বলে দাবি করা যায়। পাশাপাশি জোর দেওয়া হচ্ছে সংস্কৃত ভাষার চর্চার ওপর কারণ শুধুমাত্র 'হিন্দু সংস্কৃত' সভ্যতাই প্রাচীন এবং ভারতীয়।

তৃতীয়ত, আমাদের চোখের সামনে দিয়েই বদলে ফেলা হচ্ছে ইতিহাস। স্কুলের পাঠ্যসূচি থেকে ইতিমধ্যেই বাদ গেছে মুঘল অধ্যায়, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব, পর্যায় সারণি, পরিবেশ পাঠের নানা দিক। আগামীকাল হয়তো বাদ যাবে ইতিহাস বা বিজ্ঞানের অন্য কোনও অধ্যায়, যা ওঁদের পছন্দ নয়। আর এই সব কাজ এগোচ্ছে অতি দ্রুত। তাই একটি জাতীয় শিক্ষা নীতির প্রণয়ন হবার পর তার শিক্ষা সংক্রান্ত দিকগুলোর ভালোমন্দ ছেড়ে আমাদেরও এইসব বিজাতীয় বিষয় নিয়ে চর্চা করে যেতে হচ্ছে নিরন্ত র।

সুতরাং, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নামে এই মুহূর্তে যা যা চলছে এককথায় তা অর্থহীন, মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তা একদিকে যেমন কাল্পনিক বিষয় (যেমন গোবর ও গো-মূত্রের উপকারিতা) এবং প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত বিষয়কে (বিমান, শল্যচিকিৎসা) সত্যি বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সব কিছুর মূলে আছে হিন্দুত্ববাদ; 'হিন্দু সভ্যতা' হিসেবেই যে ভারত এক সময় বিশ্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সে কথা প্রমাণ করাই এঁদের উদ্দেশ্য, যাতে 'হিন্দুরাষ্ট্র' গড়ে তোলার উপযোগিতা বোঝানো যায়। মনে হয়, জ্ঞানধারার মুখে ভাষা থাকলে সে বলে উঠত, 'যা করছ, কর, কিন্তু নট ইন মাই নেম!'

এসব কথা নতুন নয়। লেজওয়ালা বানরকে কেউ মানুষ হয়ে উঠতে দেখে নি, তাই বিবর্তন তত্ত্ব ভুল, একথা আমরা বহুবার শুনেছি। গোরুর নিঃশ্বাসে অক্সিজেন বা দুধে সোনা পাবার কথাও শুনেছি। এখন এসব কথা আর উপেক্ষা করা যাচ্ছে না, কারণ সরকারের ঘোষিত শিক্ষানীতিতে এই বিশ্বাসগুলোকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের সরাসরি পড়ার বইয়ে ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে অনুদান দেবার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি জ্ঞানধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাই আমাদেরও দুটি কথা অহরহ মনে রাখতে, মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে। প্রথমত, বৈদিক বা প্রাক-বৈদিক যুগে ভারত নাম দেশটির স্পষ্ট রাজনৈতিক সীমারেখা ছিল না। দ্বিতীয়ত, সর্বকালেই কিছু কিছু আবিষ্কার কিছু বিজ্ঞানীর নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই আবিষ্কারের পেছনে জ্ঞানচর্চার যে দীর্ঘ ইতিহাস, তার গায়ে কোনো নাম লেখা থাকে না। অর্থাৎ জ্ঞানধারা একটি সর্বব্যাপী দেশ-নিরপেক্ষ বিষয়, স্থানভেদে যার কিছু ঘরানা

স্বীকৃত হলেও তার গায়ে একেবারে বিশেষ একটি দেশীয় ছাপ মারা যায় না (যে কথা জগদীশন্দ্র বসুও বলেছেন)। তাই ভারতীয় আবিষ্কার বলে কিছু সম্ভব হলেও ভারতীয় জ্ঞানধারা বাক্যবন্ধটিই যথার্থ নয়, বিশেষত সেই সময়কালে যখন ভারতবর্ষের বর্তমান মানচিত্রই প্রচলিত ছিল না। বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, ছাত্রছাত্রী ও সমাজে সচেতন মানুষেরা এই সমস্ত কথাই এখন নানা জায়গায় বলছেন, লিখছেন, সই সংগ্রহ করছেন, যাতে সর্বনাশটা ঠেকানো যায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রাচীন ভারত মানে শুধু বৈদিক যুগ ও আর্য সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা এবং বহুপ্রকার কুসংস্কারের চর্চাকে উৎসাহিত করাই হল জ্ঞানধারার প্রবক্তাদের নিজস্ব ধারা। কিন্তু এইভাবে ভ্রান্ত তথ্য ও ধারণার আমদানি করে ওঁরা আসলে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাটিকে কলঙ্কিতই করছেন। কারণ এতদিন অপ্রয়োজীনয় সরকারি উদ্যোগ ছাড়াই প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার গৌরবময় ইতিহাস নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জালে খোঁজ করলেই সে সবের সন্ধান পাওয়া যাবে। যেমন শুধু 'শূন্যে'র ধারণা আর 'বৈদিক গণিত'ই নয়, বরং জ্যামিতি ও বীজগণিতের অনেক জটিল তত্ত্ব ও ধারণাই যে নিহিত আছে বেদের নানারকম সূত্রের গভীরে, সেকথা প্রকাশিত হয়েছে গবেষণায়। অতি সম্প্রতি (২০১৭-২০১৮) একটি বাখশালি পাণ্ডুলিপির সূত্র ধরে কিছু অত্যাশ্চর্য প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতের গণিতচর্চা কতটা এগিয়ে ছিল। পাণিণির ব্যাকরণ, চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসা ও ভেষজবিজ্ঞান, নাগার্জুনের রসায়ন ইত্যাদি নিয়েও অনেক গবেষণা হয়েছে, যার সব কিছুই আসলে ভারতীয় জ্ঞানধারা চর্চার অংশ।

কিন্তু যা ছিল তা যত গর্বেরই হোক, তাই নিয়ে পড়ে থাকার কোনো যুক্তি নেই। কারণ জ্ঞানধারা একটি বহতা বিষয়; প্রাচীনকালের এই জ্ঞানভাণ্ডার যত উন্নতই হোক তাকে শেষকথা বলে ধরা যায় না, কারণ জ্ঞান সেখানেই দাঁড়িয়ে নেই। মানুষ তাকে উত্তরোত্তর এগিয়ে নিয়ে চলেছে এবং আধুনিক যুগে তা বিশ্বব্যাপী জ্ঞানধারার সঙ্গে মিশে গেছে। তাই আজকের যুগে দাঁড়িয়ে আমরা প্রাচীন যুগের পদ্ধতিতে মানে নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা' থেকে পদার্থবিজ্ঞান, ল্যাভয়েসিয়রের লেখা থেকে রসায়ন পড়ি না কারণ তাতে বিজ্ঞানের আধুনিকতর কাজগুলিকে অস্বীকার করা হয়, যা আসলে প্রগতির উল্টোদিকে হাঁটা। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিতে'র বদলে আধুনিক ইংরেজি গণিত বই চালু করেন। তাই কল্পনার ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার আসলে কোনো মূল্য নেই। আর তা যদি দেশের বর্তমান বিজ্ঞানচর্চাকে বিঘ্নিত করে (অনুদানে ভাগ বসিয়ে) এবং অপবিজ্ঞানের চর্চায় উৎসাহ যোগায়, তখন তা রীতিমতো অন্যায়। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস নিয়ে চর্চা হোক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে, কাল্পনিক বিষয়কে সত্যি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে নয়। গবাদি পশুর স্বাস্থ্য-বৈশিষ্ট্য-প্রজনন নিয়ে গবেষণা হোক কৃষি-পশুপালন বিভাগে (হয়ই তো!), তার ধর্মীয়-সাহিত্যিক গুরুত্ব বা অলৌকিকত্ব নিয়ে নয়!

বিজ্ঞানীর নীতিবোধ

একজন বিজ্ঞানীর উক্তি দিয়ে এই লেখা শুরু করেছিলাম। তার কারণ ভারতীয় জ্ঞানধারা এমন একটি বিষয় যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য এই বিষয়ে এত রমরমা ও অপপ্রচার শুধু রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে সম্ভব হয় নি। উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ছাড়া এই বিষয়গুলো এভাবে ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠা পেত না। এইখানেই বলা যায় বিজ্ঞানীরা তাঁদের নীতিবোধ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছেন এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বিষয়কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। কারণ বিজ্ঞানচর্চা বিজ্ঞানীর শুধু পেশা হয়ে থাকছে, জীবনের অংশ হয়ে উঠছে না। তাই ডঃ হর্ষবর্ধন, যিনি পালস্ পোলিও কর্মসূচিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তিনি কিভাবে কোনো প্রমাণের তোয়াক্কা না করে প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারি বা স্টেম সেল গবেষণা চালু ছিল, এমন কথা প্রচারে অংশ নেন! খড়গপুর আই আই টি-র স্থাপত্যবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ জয় সেনই বা কি করে ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রের জয়গান করেন! বিজ্ঞানীর নিজস্ব বিশ্বাস আর বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা দুটি যদি বিপরীতমুখী হয় আর সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানী তাহলে প্রথমটির দাবিকেই মেনে নেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা থেকে সরে আসছেন। আর সেটা সমাজের ক্ষেত্রে একটা স্লো-পয়জনের মতো কাজ করে। যেমন, আজ থেকে কুড়ি বছর আগে যে কথা কিছুটা নিন্দনীয়ভাবে বলা হত (অত বড় ডাক্তার, কিন্তু অপারেশনের আগে কালীর ছবিতে মাথা ঠোকেন!), আজ সেটা গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে (অত বড় ডাক্তারও তো অপারেশনের আগে কালীর ছবিতে প্রণাম করেন!)। স্কুলের পাঠ্যসূচি থেকে যারা পর্যায় সারণী,

বিবর্তনবাদ ইত্যাদি বোধমূলক বিষয়গুলো বেছে বেছে বাদ দিয়েছেন তাঁরা তো একেবারে অজ্ঞ সাধারণ মানুষ নন; তাঁরা কি জানেন না এর ফল কি হতে পারে! তাঁরা কি এটাও জানেন না, যে এই ধরনের পদক্ষেপের জন্য বিশ্বের কাছে ভারতের ভাবমূর্তি কিভাবে নষ্ট হচ্ছে! অর্থাৎ একটা কথা বলা হয় যে, বিজ্ঞানচর্চা বিজ্ঞানীর ল্যাব-কোটের মতো, ল্যাবরেটরির বাইরে এসেই সেটা খুলে রেখে বিজ্ঞানী একজন সাধারণ মানুষ হয়ে যান, এই ক্ষেত্রে সেটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। উল্টোভাবে বললে, বিজ্ঞানী তাঁর নীতিবোধ ও দায়বদ্ধতা থেকে সরে আসছেন বলেই অপবিজ্ঞানের চর্চা এত রমরমিয়ে উঠবার সুযোগ পাচ্ছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীর দায় ছিল বিজ্ঞানসম্মত বিষয়কে উৎসাহিত করা ও অপবিজ্ঞানের চর্চাকে বাধা দেওয়া। ভারতীয় জ্ঞানধারার প্রসঙ্গে তিনি ঠিক বিপরীত আচরণ করছেন ও তাঁর আচরণ পরোক্ষভাবেও অপবিজ্ঞানকে উৎসাহিত করছে। তাই এই লেখাতে ভারতীয় জ্ঞানধারা এবং বিজ্ঞানীর দায়বদ্ধতা পরস্পর বিরোধী অবস্থানই বজায় রাখল।

শেষ কথা

এক বিজ্ঞানীর কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, আর এক বিজ্ঞানীর একটা গল্প বলে শেষ করি। চার্চের অত্যাচারে বিপর্যস্ত গ্যালিলিওকে কেউ বলেছিল, 'একবার বলেই দিন না যে হ্যাঁ সূর্যই পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে'। উত্তরে গ্যালিলিও বলেছিলেন, 'ওরা বুঝতে পারছে না, আমি বললেই তো সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে না!' এই হল বিজ্ঞানীর দায়বদ্ধতা, যা সত্যের বাইরে আর কিছু জানেই না।

কৃতজ্ঞতা ঃ গত দু'বছরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই বিষয়ে প্রকাশিত অজস্র নিবন্ধ থেকে পাওয়া তথ্য এই লেখায় সংগৃহীত হয়েছে। এই বক্তৃতার প্রশ্নোত্তর পর্বে উঠে আসা অনেক তথ্য ও মতামতও এই লেখায় সযত্নে উল্লিখিত হয়েছে। সকলের কাছেই লেখক আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

উমা

উচ্চবর্ণের উচ্চমেধার মিথ ও ঊনিশ শতক

আশীষ লাহিড়ী

১৯১৬ সালে প্রকাশিত *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শ্রীবিলাসের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেনঃ 'শচীশ সম্বন্ধে গোড়াতেই আমি দুইটা মস্ত ঘা খাইয়াছি। আমি তাহাকে দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম সে ব্রাহ্মণের ছেলে। মুখখানি যে দেবমূর্তির মতো সাদা-পাথরে খোদা। তার উপাধি শুনিয়াছিলাম মল্লিক; আমাদের গাঁয়েও মল্লিক-উপাধিধারী এক ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু জানিয়াছি শচীশ সোনার বেনে। আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর—জাতি হিসাবে সোনার বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর নাস্তিককে নরঘাতকের চেয়ে—এমন কি, গোখাদকের চেয়েও পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।'

বদ্ধমূল বর্ণ-সংস্কারের এই পটভূমিটি মাথায় রেখে আমরা নির্জলা কিছু পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে শিক্ষাক্ষেত্রে তথাকথিত হিন্দু উচ্চবর্ণের শ্রেষ্ঠত্বের মিথটি ভাঙবার চেষ্টা করব।

১৮৫৭য় কলকাতা, বোম্বাই আর মাদ্রাজে স্থাপিত হল বিশ্ববিদ্যালয়। এই সময় মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হল। ফলত, আগে শিক্ষায় যেখানে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রমুখ কয়েকটি তথাকথিত উচ্চবর্ণরই একচেটিয়া অধিকার ছিল, ঊনিশ শতকের শেষ কয়েকটি দশকে সেই ক্ষেত্রে হানা দিলেন তথাকথিত নিম্ন জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা। এইসব উদ্যমী মানুষদের অনেকেরই সাধারণ সাক্ষরতা আর ইংরেজি সাক্ষরতার হার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য আর কায়স্থদের ছাপিয়ে গেল। ক্রমে মধ্যম স্তরের ব্যবসাবাণিজ্য, সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতেও এঁদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ল। কিন্তু উচ্চবর্ণের, বিশেষত ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রতাপ এতই বেশি যে তাদের স্বীকৃতি না-পেলে সামাজিক স্তরে শিক্ষিত, এমনকী ধনী নিম্নবর্ণের পক্ষে মর্যাদালাভ ছিল অসম্ভব। তাই শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়লেও সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের স্তরে ব্রাহ্মণদের প্রতাপ রয়েই গেল। পাশাপাশি একথাও ঠিক, সব নিম্নবর্ণই যে শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে আসতে পেরেছিলেন তা নয়। তার ওপর তাঁদের নিজেদেরও অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধক ছিল। এতসব খুঁটিনাটির মধ্যে আমরা যাব না। আমরা কেবল জানতে চাইব, পরিবর্তিত পরিস্থিতির ধাক্কায় হিন্দু সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণর জীবনজীবিকায় ও চেতনায় কী ধরনের পরিবর্তন এল—অথবা এল না।

যুগযুগ ধরে এটাই প্রচলিত যে ব্রাহ্মণরা এবং অন্য দুই উচ্চ বর্ণই ছিলেন হিন্দু সমাজের জ্ঞানবুদ্ধিচর্চার ধারকবাহক। তথাকথিত নীচু জাতের মানুষ এঁদের মর্জি, আনুকূল্য ও দাক্ষিণ্যর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু ঊনিশ শতকের শেষে আদমশুমারির ভিত্তিতে যে-পরিসংখ্যান পাচ্ছি, তা থেকে শিক্ষায় এই তিন বর্ণর কায়েমি উচ্চস্থান সম্বন্ধে কী ছবি বেরিয়ে আসে?

সারণি

জাত	সাধারণ সাক্ষরতার শতাংশ		ইংরেজি সাক্ষরতার শতাংশ	
	১৯০১	১৯১১	১৯০১	১৯১১
বৈদ্য	৪৫.৬	৫৩.২	১৫.৮৫	২০.৮৮
ব্রাহ্মণ	৩৫.৮	৩৯.৯	৮.১৯	১০.৯০
কায়স্থ	৩০.৯	৩৪.৭	৭.৫৯	৯.৮০
সুবর্ণবণিক	৩২.৩	৪৫.১	১৫.১৪	২১.৮৭

সূত্রঃ *Census of India, 1911, Vol. V, Part I, p.Subsidiary Table VI.* শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *Caste, Politics and the Raj, Bengal 1872-1937* থেকে উদ্ধৃত।

সারণিটি ভালো করে লক্ষ্য করুন। ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের সাধারণ সাক্ষরতার হার ছিল ৩৫.৮ শতাংশ; ১৯১১ সালে সেটা বেড়ে হল ৩৯.৯। তার মানে, অবিভক্ত বাংলায় ১৯০১ সালে ব্রাহ্মণদের ৬৪.২ শতাংশ ছিলেন নিরক্ষর; ১৯১১ সালে ৬০.১ শতাংশ। এবার দেখা যাক, তাঁদের ইংরেজি সাক্ষরতার হার কতটা বাড়ল। ১৯০১ সালে ৯১.৮১ শতাংশ ব্রাহ্মণ এ-বি-সি-ডি জানতেন না, ১৯১১ সালে ৮৯.১০ শতাংশ।

এবার আসা যাক, 'প্রায়-ব্রাহ্মণ' বৈদ্যদের কথায়। প্রধান তিন উচ্চবর্ণের মধ্যে এঁরাই ছিলেন শিক্ষাদীক্ষায় সবচেয়ে অগ্রসর। এঁদের সাধারণ ও ইংরেজি-সাক্ষরতার হার ব্রাহ্মণদের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এঁদের ইংরেজি সাক্ষরতার হার এঁদের নিজেদের সাধারণ সাক্ষরতার অর্ধেকও নয়! ১৯০১ সালে বৈদ্যদের প্রায় ৮৪% আর ১৯১১ সালে প্রায় ৭৯% এ-বি-সি-ডি জানতেন না।

আর কায়স্থরা? ব্রিটিশ আমলে এই বাঙালি কায়স্থরাই বাংলায় ভারতের অন্যান্য জায়গার বণিক শ্রেণির ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯১১ সালের একটি তথ্য বলছে, 'বাংলায় মালিকানাধীন যত কলকারখানা আর খনি ছিল তার ৪০%-এর মালিক ছিলেন বাঙালি কায়স্থ আর ব্রাহ্মণরা। (Owens, Raymond Lee; Nandy, Ashis (1978). *The New Vaisyas.* Carolina Academic Press. p. 81.) কিন্তু সাক্ষরতা হারে তার প্রতিফলন কোথায়? ১৯০১ আর ১৯১১-র আদমশুমারি থেকে দেখা যায়, কী-সাধারণ আর কী-ইংরেজি সাক্ষরতার হিসেবে তাঁরা বৈদ্য আর ব্রাহ্মণদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। ১৯০১ সালে কায়স্থদের প্রায় ৯২% আর ১৯১১ প্রায় ৯০% ছিলেন ইংরেজিতে নিরক্ষর। সুবর্ণবণিকদের সাক্ষরতা-হারের ধারেকাছেও ছিলেন না তাঁরা। আর এই ফারাক উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল, কমেনি। অথচ এই পরিস্থিতিতে কায়স্থ ঘরের সন্তান শ্রীবিলাস লিখেছিল, 'আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর—জাতিহিসাবে সোনার বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি'। অর্থাৎ সম্মান আর ঘৃণার মাপকাঠি হিসেবে শিক্ষাটা কোনো ধর্তব্য বিষয়ই নয়। বদ্ধমূল সংস্কারটাই যথেষ্ট।

যুগ যুগ ধরে হিন্দু সমাজে কায়েমি সম্মান আর সুবিধার অধিকারী প্রধান বর্ণের শিক্ষার হাল আমরা দেখলাম। এবার দেখা যাক, ওই একই পর্বে তথাকথিত নীচু জাত সুবর্ণবণিকদের সাক্ষরতার হার কতটা বাড়ল? ১৯০১ সালে তাঁদের সাধারণ সাক্ষরতার হার ছিল ৩২.৩ শতাংশ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের চেয়ে কম (ব্রাহ্মণ = ৩৫.৮)। ১৯১১ সালে সেটা ব্রাহ্মণদের টপকে গিয়ে হল ৪৫.১ শতাংশ (ব্রাহ্মণ = ৩৯.৯)। ইংরেজি সাক্ষরতার ক্ষেত্রে তফাতটা আরও চমকপ্রদ। ১৯০১ সালেই সুবণবণিকদের ইংরেজি-সাক্ষরতার হার ছিল ১৫.১৪ (ব্রাহ্মণ= ৮.১৯)। দশ বছরের মধ্যে ১৯১১ সালে সুবর্ণবণিক আর ব্রাহ্মণদের এ-বি-সি-ডি জানার হার হয়ে দাঁড়াল যথাক্রমে ২১.৮৭ আর ১০.৯০।

সুবর্ণবণিকদের ইংরেজি সাক্ষরতার হার ব্রাহ্মণদের দ্বিগুণ! এবং খেয়াল রাখব, এতকাল এই তথাকথিত নিম্নবর্ণ শিক্ষার যুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁদের শুরুই করতে হয়েছে অনেকখানি পিছিয়ে-থাকা অবস্থা থেকে। সেইখান থেকে লাফ দিয়ে এত ওপরে উঠে আসাটা খুবই চমকপ্রদ।

তথাকথিত নিম্নবর্ণের অনেকেই কিন্তু শিক্ষাকে অতটা গুরুত্ব দিলেন না। তাঁদের মধ্যেও কিন্তু অনেকে ব্যবসাবাণিজ্যে প্রচুর উন্নতি করলেন। অথচ এমনই জাতপাত-বিভক্ত হিন্দুসমাজের চরিত্র যে শিক্ষাদীক্ষায়, ব্যবসাবাণিজ্যে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও সামাজিক মানমর্যাদা লাভের জন্য, এইসব তথাকথিত নিম্নবর্ণগুলিকে চিরাচরিত রাস্তাই ধরতে হল। পুজো আচ্চার জন্য, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য সেই ব্রাহ্মণদেরই শরণাপন্ন হতে হল। হিতেশরঞ্জন সান্যাল লক্ষ্য করেছেন,

''মধ্য-আঠারো থেকে মধ্য-উনিশ শতকের মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় মন্দির বানানোর যে-রেওয়াজ উঠেছিল তার মূল কারণ হল, সামাজিক নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত উদীয়মান উচ্চাকাঙ্ক্ষী গোষ্ঠীগুলি এর প্রয়োজন অনুভব করেছিল''। তাঁর হিসেব মতো, ১৭৫০ থেকে ১৮৫০-এর মধ্যে যত মন্দির তৈরি হয়েছিল তার ৪৭.৭%-এর প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন নবশাখ, মধ্যবর্তী, জলচল আর অন্ত্যজ জাতিভুক্ত। তার আগের পঞ্চাশ বছরে এঁদের অনুপাত ছিল ২৭.১%; পরের পঞ্চাশ বছরে ৪৬.৪%। শেষ-উনিশ শতক আর বিশ শতকের গোড়ায় এঁরা ব্রাহ্মণদের দিতেন লোভনীয় ব্রহ্মোত্তর ভাতা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা।

প্রশ্নঃ পুজোআচ্চা, ব্রহ্মোত্তর জমিভোগ আর 'ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ' ছাড়া আর কোনো অর্থকরী পেশা এই অনুৎপাদক, পরজীবী সম্প্রদায়ের সামনে খোলা ছিল কি?

ছিল। সেও ভারি মজার কাহিনি। নিম্নবর্ণের উচ্চাকাঙ্ক্ষী সদস্যরা যখন সমাজে মান্যগণ্য হয়ে উঠতে চাইলেন, তখন তাঁদের অনেকেই জাতের পুরোনো নাম বদ্‌লে ফেলতে চাইলেন। আদমশুমারিতে জাতের যে-নাম লেখানো হবে সেটাই স্থায়ী হয়ে যাবে। সুতরাং নতুন নাম লিখিয়ে, কিংবা পুরোনো নামের আগে বা পরে নতুন উপসর্গ বসিয়ে তাঁরা তথাকথিত নীচু জাতের গ্লানি মুছতে চাইলেন। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, সদ্‌গোপ, তিলি, মধুনাপিত, ফুলনাপিত, মাহিষ্য, সচ্চাষী, রাজবংশী, যোগী আর নমশূদ্র জাত তার উদাহরণ।

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটার পর তাঁদের অনেকের মনে হল, জাতের স্থানীয় পেশা-ভিত্তিক নাম মর্যাদালাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অনেকেই বর্ণাশ্রম-স্বীকৃত তিনটি 'দ্বিজ' বর্ণর মধ্যে স্থান খুঁজতে চাইলেন। হয় ব্রাহ্মণ, নয় ক্ষত্রিয়, নয় বৈশ্য। কিন্তু প্রোমোশন চাইলেই তো মেলে না, তার জন্য দরকার হয় অনুমোদন আর সুপারিশ।

এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় সুপারিশ। কার সুপারিশ? কার অনুমোদন? কার আবার, সেই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের। আর এইখানেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা একটা নতুন পেশার সন্ধান পেলেন। বর্ণকাঠামোয় উচ্চতর স্থান লাভের অভিলাষে প্রতিটি জাতই কোনো না কোনো আদি পৌরাণিক উৎসর দোহাই দিতে লাগল। কখনো কখনো জাল কিংবা অসম্পূর্ণ পৌরাণিক শ্লোক উদ্ধৃত করতে লাগল। সেগুলো সংগ্রহ করার জন্য তাঁদের যেতে হল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে শাস্ত্রীয় ''ব্যবস্থা'' এনে নিজেদের কাল্পনিক দাবিগুলিকে ন্যায্য বলে প্রমাণ করতে হল।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রক্রিয়াটির কিছু সুনির্দিষ্ট নমুনা দিয়েছেন। প্রথম প্রথম উচ্চাভিলাষী শূদ্র জাতগুলির ব্যাপক অংশই বৈশ্য বর্ণের মর্যাদা দাবি করেছিলেন। যুক্তি হল, বৈদিক যুগে তো কৃষি আর ব্যবসাবাণিজ্য ছিল বৈশ্যদেরও বৃত্তি। কিন্তু ছিল যে, সে ব্যাপারে কার রায় সমাজমান্য? ইংরেজ সরকার সে বিষয়ে কিছু বলবার অধিকারী নয়। অধিকারী কারা? সেই আদি ও অকৃত্রিম নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা। শুধু নিম্নবর্ণ কেন, খোদ বৈদ্যরাও চাইলেন অম্বষ্ঠ (যাঁদের জাতিগত অবস্থান ব্রাহ্মণদের ঠিক নীচে) জাতের অন্তর্ভুক্ত হতে। বৈদ্যই হোক আর শূদ্রই হোক, প্রতিটি দাবি ন্যায্য প্রমাণ করবার জন্য নবদ্বীপ থেকে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের লিখিত ''ব্যবস্থা'' নিয়ে আসতে হত। আর প্রয়োজন এবং দক্ষিণা সাপেক্ষে যখন যেমন তখন তেমন সার্টিফিকেট লিখে দিতেন নবদ্বীপের মহা মহা পণ্ডিতরা। 'প্রেসিডেন্সি মাহিষ্য সমিতি' ১৯০১ সালের আদমশুমারির সময় নিজেদের বৈশ্য প্রমাণ করার জন্য বাংলা আর বিহারের বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের মত পেশ করেছিলেন, যাঁরা এর সমর্থনে পুরাণ আর সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৩১ সালে বদলে গেল মতটা। তখন তাঁরা বর্ণকাঠামোয় আর এক ধাপ ওপরে উঠে ক্ষত্রিয় হতে চাইলেন। বললেন, সেটাই তাঁদের আদি বর্ণ-পরিচয়। অনুমান করতে অসুবিধা নেই, তখন আবার নগদ দক্ষিণা দিয়ে নবদ্বীপ থেকে নতুন ''ব্যবস্থা'' নিয়ে আসতে হয়েছিল। কলকাতার 'যোগী হিতৈষিণী সভা' ১৯০১ সালে আদমশুমারি কমিশনারের কাছে ব্রাহ্মণত্বর মর্যাদা দাবি করেছিলেন। একই ভাবে নমশূদ্ররাও নিজেদের ব্রাহ্মণত্ব দাবি করে সেই মর্মে 'ব্যবস্থা' জোগাড় করলেন। রাজবংশীরা ১৯১১র আদমশুমারির ঠিক আগে নিজেদের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় উৎপত্তি নিয়ে জাঁক করতে লাগলেন এবং সেই দাবির সত্যতার সপক্ষে নবদ্বীপের পণ্ডিতদের অনুমোদন নিয়ে এলেন। ১৯০১ সালের পর থেকে পোদরাও নিজেদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতে চাইলেন আর সেই দাবির সমর্থনে *মনুসংহিতা* আর *পরশুরামসংহিতা* থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণদের পোয়াবারো। সুতরাং লেখাপড়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক না থাকলেও, উনিশ-বিশ শতকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ভুয়ো সার্টিফিকেট লেখার একটা পেশা তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা ছিলেন একবিংশ শতকের শিক্ষা-জোচ্চোরদের পথপ্রদর্শক।

এক শ্রেণির গোঁড়া ব্রাহ্মণরা ভান করতেন, সমাজের কিছুই যেন বদলায়নি। ১৯৩১ সালের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, তাঁদের ধারণা, ব্রাহ্মণেতর সব জাতই শূদ্র, সুতরাং অশুচি, আর তাই তারা সকলেই সমান ঘৃণ্য। সেখান থেকে তাদের মুক্তির কোনো পথ নেই, কারণ প্রত্যেকের দুর্গতিই যার যার জন্মনির্দিষ্ট।

১৮৫৩ সালে বিদ্যাসাগর মশাই লিখেছিলেন, 'ভারতের পণ্ডিতসম্প্রদায়কে ইউরোপের আগুয়ান বিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দানে রাজি করানো এক অসাধ্য কাজ। এঁরা হচ্ছেন এমন একদল মানুষ যাঁদের দীর্ঘলালিত সংস্কারগুলো একেবারে অনড়। ...এঁদের বিশ্বাস, যেসব ঋষিরা শাস্ত্র রচনা করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সর্বজ্ঞ, সুতরাং তাঁদের কোনো ভুল হতে পারে না। তিনি তাই এইসব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আধুনিক সভ্যতা-বলয়ের বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন। এতক্ষণ যেসব তথ্য নিয়ে আলোচনা করলাম, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসগর মশাইয়ের দূরদৃষ্টির উদ্দেশে কয়েকটি বাড়তি সেলাম ঠুকে দেওয়া উচিত নয় কি?

(এই রচনায় ব্যবহৃত প্রায় সব তথ্যরই উৎস, Sekhar Bandyopadhyay, *Caste, Politics and the Raj*, K.P. Bagchi, 1990)

উমা

করে দেখো ভালো লাগবে (৪)

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

এতো দিনে আগের আগের লেখাগুলো পড়ে তোমরা নিশ্চয়ই বন্ধুদের আড্ডা বানিয়েছো, গল্পের বই ভাগ করে পড়েছো, পোস্টার লিখেছো, পোস্টার লাগিয়েছো, দেওয়াল পত্রিকা বানিয়েছো।

এবার কয়েকটা প্রশ্ন বানিয়ে দিচ্ছি, যা নিয়ে তোমরা বাড়ির লোকেদের সাথে কথা বলতে পারো, বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা করতে পারো, পোস্টার বানাতে পারো, দেওয়াল পত্রিকায় লিখতে পারো, এমন এমন সব কিছু করতে পারো।

কেন বানালাম প্রশ্নগুলো? আমি উত্তর দিতে পারি। আমি চাই তোমরাই উত্তর দাও। চেষ্টা করে দেখো, পারবে।

আমাদের চারপাশে নানা ভাগ বানানো চলছে। সেই ভাগ দিয়ে নানা কাণ্ড করা চলছে, কাউকে ভালো বলা হচ্ছে, কাউকে খারাপ বলা হচ্ছে, কাউকে প্রশংসা করা হচ্ছে, কাউকে নিন্দে করা হচ্ছে। কারোর সাথে মিশছি, কারোর সাথে মিশি না। কাউকে বড়ো করে দেখি, কাউকে ছোটো করে দেখি। কারোর কথা শুনি, কারোর কথা শুনি না। এমন সব চলছে।

এমন সব নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন বানিয়েছি। তোমাদেরকে পাঠালাম।

তোমরা পড়ো, ভাবো। অন্যদেরকে পড়াও, ভাবাও। যা মনে হবে লিখে ফেলো। লেখাটা নিজের কাছে রেখে দাও।

একবার পড়া ও পড়ে ভাবনাটা লেখা হয়ে গেলো তো? একটু পরে আবার পড়ো। ভাবো। নিজের পড়া হয়ে গেলে বাড়ির সবাইকে পড়ে শোনাও, কথা বলো। যা শুনলে তোমার আগের লেখাটার সাথে লিখে ফেলো।

বন্ধুদের পড়ে শোনাও। কার কি মত শোনো। আড্ডা দাও ভাবো। তোমার লেখায় যোগ করো।

এমনও হতে পারে। এমন সব প্রশ্ন পড়ে তোমারও মনে প্রশ্ন তৈরি হলো। লিখে ফেলো। আমাদেরকে পাঠাও।

আর এর মধ্যে যদি পোস্টার লেখা, দেওয়াল লেখা, হাতে লেখা পত্রিকা বানিয়ে ফেলে থাকো তাহলে সেখানে এই প্রশ্নগুলো লিখে দেখাও।

আমরা তোমাদের কাছ থেকে আরো সব প্রশ্ন পাবার অপেক্ষায় থাকলাম।

এবার প্রশ্নগুলো পাঠাই। তোমরা পড়ে দেখো। ভাবো।

১. বাজার থেকে ফসল কেনার আগে কি জেনে নেবো ফসলটি যে চাষ করেছে সে হিন্দু চাষি না মুসলমান চাষি? ২. ট্রেনে চড়ার আগে কি জেনে নেবো ট্রেনটির চালক মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ না হিন্দু? ৩. আমার মায়ের অসুখের জন্য যখন রক্ত লাগবে আমি কি আগে ভাগে জেনে নেবো যার রক্ত মাকে দিচ্ছি সে কোন মাংস খায়? ৪. কারখানায় বানানো জিনিস বাড়িতে নিয়ে আসার সময় আমি কি জানতে পারি যে বানিয়েছে সে বাড়িতে কোন ভাষায় কথা বলেঙ্ম বাংলায়, উর্দুতে নাকি হিন্দিতে? ৫. আমাদের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটি যখন স্কুলের বেঞ্চিতে বসবে, তখন সে কি জেনে নেবে তার পাশে যে বসে আছে তার ঠাকুরদা, ঠাকুমা, দিদিমা, দাদু পাশের কোনো দেশ

থেকে এসেছে কিনা, এসে থাকলে কবে এসেছে, কেন এসেছে, তাদের এই আসার কোনো কাগজপত্তর আছে কি না, তবেই তার সাথে টিফিন ভাগ করে খাবে? ৬. ক্যালেন্ডারে কি শুধুই কবে কোন ধর্মের কি উৎসব থাকা দরকার? নাকি কোন মাসে কোন ফসলের বীজ পোঁতা আর কোন মাসে কোন ফসল কাটার সময় সেটাও থাকা দরকার? ৭. ট্রেনে যে হিন্দিভাষী মালবাহক মাল তুলে সব ঠিকঠাক গুছিয়ে দিল, তার কাছ থেকে কি জেনে নেবো সে বিহারী না উত্তর প্রদেশী? ৮. খাবারের দোকানে খেতে বসে কি জেনে নিতে হবে যে মানুষটি টেবিলে খাবার এনে সাজিয়ে দেবে তার কি জাত? ৯. পোস্টার এঁকে কি জেনে নেওয়া দরকার এতে যা লেখা হলো তা কোনো আইনে বারণ কি না? ১০. স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে কি জেনে নেবো ইংরাজির শিক্ষকের লেখাপড়া কোথায়? শহরে না গ্রামে? ১১. একটা লেখা লিখে কাউকে কি দেখিয়ে নিতে হবে যে এতে কারোর ক্ষমতাকে নিন্দে করা হয়নি? ১২. পূজায় যা যা লাগে তা কেনার আগে কি জেনে নেওয়া দরকার যারা বানিয়েছে তাদের কি জাত? কি ধর্ম? ১৩. বই কেনার আগে কি জেনে নেবো যে বইটা বানিয়েছে সে ব্রাহ্মণ না দলিত? ১৪. ক্রিকেটে, ফুটবলে ভারতের খেলা দেখার সময় হাততালি দেবার আগে কি জেনে নেওয়া দরকার তার ধর্ম, ভাষা? সে কোন রাজ্যের লোক?

আমি এবার থামছি।

প্রশ্নগুলো পড়ো, ভাবো। তোমরা পড়ো, ভাবো। অন্যদেরকে পড়াও, ভাবাও।

যা মনে হবে লিখে ফেলো।

একবার পড়া হয়ে গেলে, একটু পরে আবার পড়ো, ভাবো। নিজের পড়া হয়ে গেলে বাড়ির সবাইকে পড়ে শোনাও। কথা বলো। বন্ধুদের পড়ে শোনাও, কার কি মত শোনো। আড্ডা দাও। ভাবো।

এমনও হতে পারে, হবেই, এমন সব প্রশ্ন পড়ে, ভেবে তোমারও মনে প্রশ্ন তৈরি হলো। লিখে ফেলো, আমাদেরকে পাঠাও। আমরা ছাপাবো এই পত্রিকায়।

আর এর মধ্যে যদি পোস্টার লেখা, দেওয়াল লেখা, হাতে লেখা পত্রিকা বানিয়ে ফেলে থাকো তাহলে সেখানে এই প্রশ্নগুলো লিখে দেখাও, এঁকে দেখাও।

আমরা তোমাদের কাছ থেকে আরো সব প্রশ্ন পাবার অপেক্ষায় থাকলাম।

সব কিছুকে প্রশ্ন করো। প্রশ্ন বানাও।

উমা

গাছেদের আপনজন— পুরুলিয়ার দুখু মাঝি

সঞ্জয় অধিকারী

দুখু মাঝির দেখা পেতে পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি ব্লকের সিঁদরি গ্রামে যেতে হবে। এক সময় সেখানকার অতি দরিদ্র মানুষদের আশেপাশের একটু অবস্থাপন্নদের বাড়িতে কাজ করে পেট চালাতে হত। দুখু মাঝিদের কিছু জমিজমা থাকলেও তাঁরা মোটেই স্বচ্ছল ছিলেন না। তাই তাঁর বাবামঙ্গল মাঝি মোহন সাউ-এর বাড়িতে কাজে লাগেন। সেখানে বাগানে গাছ লাগাতেন। কাজটা ভালই লাগতো, তাই বেশ মন দিয়েই করতেন। বাবার এই গাছ-প্রীতি ছেলের ভেতর সঞ্চারিত হয়। এভাবেই দুখুর সাথে গাছেদের আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। বৃদ্ধ দুখুমাঝির প্রতিদিন একটা গাছ লাগানো চাই। নইলে চলে না।

পেটানো শরীর। মাঝারি উচ্চতার মানুষটির কাছে বয়স জানতে চাইলে বলেন—ষাট থেকে আশির মধ্যে হবে। তিনি একটি সাইকেল পেয়েছেন। সাইকেলের সামনে লেখা আছে ''Presented by: Save Ajodhya Hills Purulia'' প্রায় দিনই ছোট সেই সাইকেলটিতে চলেছেন দুখু মাঝি আর তাঁর গাছের চারারা। না, আবার বলি এই গাছ লাগানোটা তাঁর হবি বা শখ নয়। এটা তাঁর অভ্যাস। সেই ছোটবেলা থেকে তিলে তিলে গড়ে ওঠা এক সুঅভ্যাস। আর এই অভ্যাসটাই দিনে দিনে গড়ে দিয়েছে গাছেদের সাথে তাঁর প্রাণের সম্পর্ক। আমরা যেমন নিজের শরীরকে, মনকে ঠিক রাখার জন্য ভাবি, কিছু না কিছু করি; তিনিও ঠিক তেমনি এই পরিবেশটাকে ঠিক রাখার জন্য প্রতিদিনই হয় গাছ লাগাচ্ছেন অথবা তাদের দেখভাল করে চলেছেন। এটা তাঁর প্রাত্যহিক কাজ। না, না, প্রচারের আলোতে আসার জন্য বা খবরের কাগজে নিজের ছবি বার হবে এর জন্য এটা তিনি করেন না। এটা করেন নিজের বোধ নিয়ে, নিজের মানবতা নিয়ে, নিজের সচেতনতা দিয়ে। বাবার মতোই তিনি দেখেছেন আগের বাঘমুণ্ডিকে। আবার দেখছেন এখনকার বাঘমুণ্ডিকে। অযোধ্যা পাহাড়কে। পাহাড়ের আগের ঘন জঙ্গল আজ কেমন যেন একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মাথার থেকে চুল উঠে যাওয়ার মতো পাহাড় থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে সবুজ। ক্রমে ক্রমে নেড়া হচ্ছে পাহাড়। ভরে যাচ্ছে প্লাস্টিকে। তাই বলতে

শেষাংশ ৩১ পাতায়

ঋতুকথন — ৫০ বছর পরিক্রমা

যশোধরা রায়চৌধুরী

যৌনতা ও ঋতুস্রাব—এই শব্দ দুটিই অনেকের কাছে আতঙ্কের। অনেকে হয়ত বলবেন, ব্যাপারটা খুব সেনসিটিভ কিনা, তাই চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। না তেমন 'বুদ্ধিমান' আমরা হতে চাই না। মেয়েদের স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া নিয়ে গুজগুজ ফুসফুস নয়, আমরা চাই বিষয়টি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা, তর্ক, এমনকি ঝগড়া। নিবন্ধটিতে লেখিকা তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। — সম্পাদকমণ্ডলী

শহর যেখানে শেষ সেই প্রান্ত থেকে মাত্র একঘণ্টা একটা সরু কালো এবড়োখেবড়ো রাস্তায় চলে, পথের বাঁকে একটি মাছের পাইকিরি হাটের প্রচণ্ড জ্যাম ঠেলে, হঠাৎ গজানো বিউটি পার্লার, ভুঁইফোঁড় মন্দির পেরিয়ে একটা আচমকা ফাঁকা মাঠ, পুকুরের মাঝখানে এসে পড়া। কন্যাশ্রীর সাইকেলে দু বিনুনি মেয়েদের দেখতে দেখতে চলা। ছোট ছোট বাড়ির ফাঁকে হঠাৎ রাস্তাটা শেষ। তারপর একদিকে অবিন্যস্ত প্লটে ফিল্ম সিটি লেখা থাকে। জিপিএস ম্যাপ বেমালুম বেপাত্তা হয়। অন্যদিকে ঝাঁ চকচকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি আলাদিনের প্রাসাদের মতো উঠে গেছে।

কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রুরাল ক্যাম্পাসে' কখনও নারী ও তার সামাজিক অবস্থান বিষয়ে বক্তৃতা করতে গিয়েছেন? এই অধম গিয়েছে। নারীবিষয়ক সেমিনারে তুমুল উপচে পড়া ভিড় কারণ ক্রেডিট পাওয়া যাবে অ্যাটেন্ডেন্স দিলে। পুষ্পগুচ্ছ প্রদান ও পরিচয় করানোর আনুষ্ঠানিকতার পর একটু একটু করে কথা শুরু হয়। কেতাবি কথা। কিন্তু অনেকগুলো জোড়া চোখ উচ্চকিতভাবে বক্তার দিকে চেয়ে। কারুর হাই ওঠে না। পোডিয়াম থেকে বক্তা লক্ষ্য করেন, গ্রামীণ এই মেয়েরা কিন্তু কেউ জড়োসড়ো তো নয়ই, বিএ এমএ ক্লাসের সবাই আধুনিক পোশাকে স্বচ্ছন্দ। শহর গ্রামের বিভেদ উত্তর-উদারীকরণ ভারতে ঘুটে তো গেছে বহুদিনই। তথাপি পোশাক পরার অধিকার নিয়েও যে এত খোলাখুলি আলোচনা চলতে পারে, এ ছিল বক্তার প্রত্যাশার বাইরে। 'আমার শরীর আমার অধিকার' স্লোগান নিয়ে সুস্থ বিতর্ক জমে ওঠে। দূর থেকে দেখেন, একটি সিটে ঘেঁষাঘেঁষি করে তিনটি বোরখা পরিহিতা মেয়ে। এখানে ছেলেরা জিন্স বা প্যান্ট আর শার্টে।

এরপর প্রশ্নোত্তরের পালা।

ম্যাডাম, আমাদের এই আলোচনাগুলো কি শুধু সেমিনারের চার দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে? আমাদের মা বা দিদিমার কোনও কাজে লাগানো যাবে না?

আলাদা আলাদা কণ্ঠ এবার কথা বলছে। আমাদের যে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিতে চায় পরিবার, তাদের কী বোঝাব? আমার ঠাকুমাকে কীভাবে বলব, ঋতুকালে পুজোর আসন বা আচারের বয়াম ছোঁয়াছুঁয়ির নিষেধ আসলে অবৈজ্ঞানিক? সিঁদুর পরা বা নোয়া পরার সঙ্গে পরিবারের স্বাস্থ্য বা ভালো থাকার সম্পর্ক নেই?

প্রশ্নের বাঁধ ভেঙে যায়। বক্তা চমকে যান। থমকেও। ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন শুনে কিছুটা অবাক হয়ে যান। ওএ দেখেন যে, মেয়েটি যখন ঋতু বিষয়ক প্রশ্ন করল, দেড়শোটি তরুণ তরুণীর কারো চোখে নিষিদ্ধতা ঝিলিক দিল না। একটি ছেলের মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। আলোচনার গতিবেগ দেখে সে হাসি সম্বরণ করে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের সিটে নড়েচড়ে বসে। একতরফা বক্তৃতার তুলনায় এই আলোচনায় অংশগ্রহণ তাদের বেশি উৎসাহিত করছে।

এই প্রশ্ন করার পরিসর, গ্রামীণ কোনও অঞ্চলে তো দূরস্থান, আমাদের কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্ত পরিসরেও পঁচিশ কি ত্রিশ বছর আগে ছিল কি? না। তবে আমার প্রথম রজোদর্শনের কথা হোক।

একটা দ্বীপের মতো ছিল আমাদের পরিবার। আমাদের পুরুষবিহীন পরিবার। বাবা মারা গেছেন আমার এগারো মাস বয়সে। তারপর থেকে ৬৪ নম্বর বাড়ির দোতলাটা হয়ে গেছে নারীদুর্গ। দুর্গার মতো আমার মার শাসনে আমরা সেখানে সর্বদা কন্টকিত, কিন্তু একইসঙ্গে পুরুষদের জগত নিয়ে কোনওদিন মাথাব্যথা করতে হয় নি আমাদের। অন্তত আমাকে।

শুধু এক আধবার মা বাধ্য হয়েছিলেন পুরুষ কাজের লোক নিয়োগ করতে, আমার তখন বয়স ছয় কি সাত। সেইসময়েই বুঝে গেছিলাম, খেলা করতে করতে সেই কাজের লোকটি আমাকে যেভাবে স্পর্শ করছে, তার মধ্যে নোংরা, অস্বস্তিকর, বিশ্রী কিছু আছে। বিশেষত সে কখনো আমার মায়ের সামনে সেই খেলাটা করে না, মা বাড়িতে না থাকলেই কেমন চোরের মতো হেসে আমাকে বলে, খেলবে? আমি না বলতে চাই, পারি না, কিন্তু আমার আপাদমস্তক নোংরা লাগে।

...মাকে বলেছিলাম আমি, আমার অস্বস্তির কথা। মা গম্ভীর হয়ে গেছিলেন। পরদিন থেকে সেই লোকটিকে আর বাড়িতে

দেখা যায় নি। মায়ের খুব অসুবিধে হয়েছিল নিশ্চয়ই। খুবই কর্মপটু ছিল সে।

ওইরকম সময়েই হঠাৎ দেখলাম আমার থেকে সাড়ে পাঁচ বছরের বড় দিদি কেমন পাল্টে গেল, আমার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে ফেলল। আমি আর দিদি জল ছোঁড়াছুঁড়ি করে স্নান করতাম, সেটা হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল। আমি সাগ্রহে দিদিকে ডাকছি, দেখছি দিদি আর মা দুজনেই কেমন গম্ভীর, বলছে না কেন দিদি আমার সঙ্গে আর স্নান করতে চায় না। খুব রাগ হয়েছিল দিদির ওপর।

আমরা যখন ক্লাস সিক্স, মেয়ে ইস্কুলে পড়ি, বাংলা মিডিয়াম সরকারি স্কুল। সরকারি স্কুল। তখন থেকেই বান্ধবীদের মধ্যে কেমন একটা সোরগোল পড়ে গেছে। কী সব গোপনীয় আলোচনা হয়, সবাই সবাইকে বলে না। একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, তারা কেবল নিজেরাই এগুলো নিয়ে কথাটথা বলে, আর হাসে। অথবা আমাদের সামনে কেমন একটা কোড ল্যাংগুয়েজে কথা বলে চলে।

প্রথম দিকে তো কিছুই বুঝতাম না। ধীরে ধীরে সেভেনে উঠলাম। ততদিনে ব্যাপারটা জেনেছি, জেনে শিউরে উঠেছি ঘেন্নায়। আমাদের ক্লাসে আমি বোধহয় সে সময়ে একেবারেই ব্রাত্য, সংখ্যালঘু। আমার 'হয় নি'। 'ওটা' হয় নি।

মেয়েরা অনেকেই আজকাল খেলার ক্লাসে দিদিমণিকে বলে চুপচাপ এক সাইডে বসে থাকে, খেলে না। কেউ কেউ সবুজ স্কার্টে একচিলতে লাল দাগ লাগার দুর্ভাগ্যে মুহ্যমান হয়ে যায়, সবাই তাকে ঘিরে ধরে, হাসাহাসি হুল্লোড় হয় তা নিয়ে। তারা বাথরুমে গিয়ে ধোয়াধুয়ি করে আসে, তাতে ওই ভিজে দাগ তখন 'ওটার', মানে বিভীষিকাটার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তারপর তো রাস্তা দিয়ে কীভাবে বাড়ি যাবে সেই টেনশন আছেই। শীতকালে খুব সুবিধে, সোয়েটার খুলে কোমরে জড়িয়ে রাখা যায়। প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে আবার রকবাজ ছোঁড়ারা আছেই, মেয়েদের ওপরে তীব্র দৃষ্টি মেলে। কাজেই তাদের চোখকে ধোঁকা দিতে হবে। এমনিতেই ত আমরা পথে পুরুষের দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে যাই, প্রায় নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

যারা আমার মতন, ১৩ বছর বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু ওটা হয় নি, তারা তো অবশ্যই অ্যাবনর্মাল। তাদের আর কবেই বা হবে? নিশ্চয় কোনদিনও হবে না। তারা এই লাইনে দীক্ষিতও নয়, তাই বাকিদের গসিপে তাদের কোনও অধিকারও নেই। ভয়ানক রকমের একটা হীনমন্যতা আমার ওপর চেপে বসেছে ততদিনে। একইসঙ্গে আবার ভাবছি, যাকগে অ্যাবনর্মাল হয়ে বোধ হয় ভালই হল, আমাকে আর স্কার্টে দাগ লাগার ঝামেলায় থাকতে হবে না।

এইরকম অবস্থায় একদিন হল। চটচটে ব্রাউন কিছু একটা দেখা গেল ইজেরে। মাকে বলতে বলতে ভীষণ রাগ হল জিনিসটার ওপরে। আর আমার মা একটুও আমার বন্ধু না। সবসময় যেন চাপে আছেন, সবসময়ে বলছেন, উই তোদের মানুষ করতে করতে আর পেরে উঠছি না। তো তাঁর কাছে কোনও সমস্যা নিয়ে যেতে একটু কুণ্ঠাও হয়।

মা বললেন, হুঁ, তোর শরীর খারাপ হয়েছে।

এই একটা রহস্য আমি কোনোদিন ভেদ করতে পারি নি।শরীর খারাপ হওয়া মানে তো জানতাম জ্বর হওয়া, শুয়ে থাকতে হওয়া, মাথা ঘোরা, বমি হওয়া। এই বস্তুটার নাম শরীর খারাপ কেন? অথচ সবাই ওটাই বলে, ওটাই সবাই বোঝে। সবাই বলতে অবশ্যই মেয়েরা।

বাড়িতে পুরুষমানুষ ছিল না এই রক্ষে। এমনিতেই যে ট্যাবুর আড়ালে এই পুরো ঘটনাটা ঘটল। আর তার সঙ্গে মায়ের এগিয়ে দেওয়া ন্যাকড়া জড়িয়ে বানানো ঘরেলু প্যাড, যার পরিধান অসম্ভব অস্বস্তিকর। বিশ্রী একটা ভারবাহী গর্দভের মতো লাগতে শুরু করল। এবং সেই পরিধানে কোনো স্বস্তি যেমন নেই, শান্তিও নেই। যে কোনও মুহূর্তে লিকেজ হয়ে যাবে, যে কোনও মুহূর্তে জামাকাপড়ে 'দাগ' লাগবে। দাগ শব্দটা আর এক ট্যাবু শব্দ। ইশারায় বলা হবে। নানারকম মুখভঙ্গি করে। অনেক পরে দেখলাম, মেয়েরা নিজেদের আড্ডায় এইসব ইশারা চালাচালি করতে খুব ভালবাসে। সবটাই করা হয় গলা অস্বাভাবিক নামিয়ে। নিষিদ্ধতা মাখিয়ে। যদিও এটা আগেই জানা যে ওই ঘরে কোনও পুরুষ নেই, এবং ঐ ঘরে কোনও বাচ্চাও নেই, যে বাচ্চাটি কোনভাবে সন্দেহ করতে পারে, যে দুধেভাতে নয়, অথবা মেয়ে হিসেবে ওই ধাপ উত্তীর্ণ হয় নি। কত অকথিত নিয়মকানুন এই ব্যাপারকে ঘিরে। সেইরকমই আড্ডায় জমায়েতে, প্রায়শই, মামি বা মাসি বা দিদিরা, চোখ ঘুরিয়ে বলবে, দ্যাখতো আমার লেগেছে কিনা, বলে একবার সামনে ঘুরে যাবে ...সব সময়ে 'দাগ লেগে যাবার' ভয়।

আসলে আমার চিরদিনকার একটা ট্যালা, ন্যালাক্যাবলা ইমেজ। আমার ভেতরে ভেতরে মেয়েদের সঙ্গে এই আইডেন্টিফিকেশন নেই। হয়ত আমার ভেতরে কাজ করেছে ডিনায়াল, অস্বীকার। তাই, পেটে প্রবল ব্যথা, গা ম্যাজম্যাজ, আর দ্রুত উষ্ণ ধারায় ক্ষরণে স্নাত হবার প্রবল অস্বস্তি ...এইসব ব্যাপারের শরীরী ডিসকমফর্ট, এগুলো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত

থেকেছি একা একাই। কিন্তু এ নিয়ে যত গসিপ তার কোনটাতেই আমি থাকতে চাই না, ভাল লাগত না থাকতে। ঠিক যেমন থাকতাম না, বা না শোনার ভান করতাম স্কুলের মেয়েদের বলা 'অশ্লীল' জোকস ... বা পাড়ার দাদাদের সঙ্গে আন্টুশান্টুর গল্প ... যদিও কানে যেত সবই, আর না শোনার ভান করেই নিশ্চয় শুনে নিতাম সেসব।

পিরিয়ডস্, শরীর খারাপের এই ইংরিজি প্রতিশব্দটা তখন চালু হয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু স্কুল বা পারিবারিক গন্ডিতে এটা নিয়ে, এটাকে আড়াল করা নিয়ে যা যা হত, কথিত অকথিত ...বোঝা না বোঝার স্তর পেরিয়ে রাগ হত চরম। কেন কেউ খোলাখুলি কিছু বলবে না। কেন এমন একটা ভাব করা হচ্ছে যেন যার শরীর খারাপ বা পিরিয়ড হয়েছে সে একটা অপরাধী, বা সবার কাছে হাস্যাস্পদ একটি বস্তু? সহজে কেন মেনে নেওয়া যাবে না ব্যাপারটা? কেন আলোচনা করা যাবে না? ঠিক যেমন আলোচিত হবে না দিদিমণিদের সায়েন্স পাঠের সময়, পরাগসংযোগ অংশ। সাদা শাড়ি পরা বায়োলজির দিদিমণি মুখ লাল করে বলবেন, ওটা নিজেরাই পড়ে নিও। আর, সারা ক্লাস মেয়েরা উশখুশ করবে, খুক খুক করে কাশবে, হেসে মুখ লাল করবে।

'ওটা'র নিষিদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মকানুনের নানান বহর শুরু। পুজোর সময় অঞ্জলি দেওয়া, বা পুজোর ঘরে ঢোকাও মানা এই জিনিসটা হলে। কারণ ওই সময়ে তুমি অশুদ্ধ। আমার ওই ছোট্টবেলায় আবার সরস্বতী পুজোয় বা লক্ষ্মী পুজোয় বেশ উপোস টুপোস করার ঝোঁক ছিল। সেগুলো ভেস্তে গেলে মন খারাপ হত। তবে স্পোর্টসে খুব খারাপ ছিলাম বলে, খেলার ক্লাসে যে একটা ছুতোয়, বসে থাকতে পারা যেত সেটা বেশ ভাল লাগত।

মায়ের একটা আবিষ্কার ছিল, নিউ মার্কেট থেকে কিনে আনা প্লাস্টিক প্যান্টি। নিউ মার্কেটের মাঝের গোল চক্করটায় সেই পুরনো রাহমত আলির দোকানেই বোধ হয় পাওয়া যেত। খুব কার্যকরী ছিল সেটা। এই 'দাগ' লাগার থেকে অব্যাহতি। প্র্যাক্টিকাল জীবনে আমরা তখনো মায়ের পুরনো ছেঁড়া শাড়ির টুকরো, যাকে 'ন্যাকড়া' বলা হত, তাতে জড়ানো তুলো ব্যবহার করে থাকি। হয়ত বাবাহীন সংসারে মায়ের ইকনমাইজ করার ফল, কারণ আমার স্কুলের বন্ধুরা ততদিনে অ্যাঞ্জেল, কেয়ারফ্রি ইত্যাদি ব্যবহার শুরু করেছে। আমি করি নি অন্তত আমার ষোল সতের হবার আগে অব্দি। এখনো মনে আছে, সেইসব হীনমণ্যতাবোধের বিরক্তি। আর মনে আছে ভেপশে ওঠা গরমে প্যান্টির ভেতরে লাইনিং ধরে র‍্যাশ হয়ে যাওয়ার অনুভূতি। মনে পড়লে আজও গা গুলিয়ে ওঠে।

একা একা, একলা একলা কেটে যাওয়া আমার কৈশোর, প্রবল মনখারাপের কৈশোর, অনেকটাই কেটেছে এই বিষাদে। যেমন প্রথমদিকের প্রতিটি ঋতুকালে চূড়ান্ত পেটে ব্যথা হয়েছে, ব্যথার সময়ে চুপটি করে বসে থেকেছি, প্রবল ভয়ের ঢেউ খেলে গেছে ভেতরে। আসলে শুধু অস্বস্তি, শুধু এই ব্যাপারটাকে 'ম্যানেজ' করতেই হবে যে, সেই সমস্যার মোকাবিলা নয়। তার সঙ্গে যুক্ত এটা নিয়ে সব চাপাচাপিগুলো। পুরুষেরা কখনো ভুলক্রমেও এই বিষয়ে কথা বলবেন না। আর মহিলারা বলবেন ঃ 'আমি চাই না আমার মেয়ে হোক। ওর আবার এই কষ্টটা পেতে হবে' (আমার বায়োসায়েন্স-এ দারুণ তুখোড় বান্ধবী) ...বলবেন, পাপ, পাপ! বলবেন, ছেলেদের কেন এটা হয় না বল তো? ভগবান কেন আমাদেরই শুধু মেরে রেখেছেন? চূড়ান্ত কিছু আত্মমর্ষণ, আগে থেকেই হেরে যাওয়া, পরাভব স্বীকার করে নেওয়া। এটাকে অভিশাপ ভাবতে শেখানো। অভিশাপের ব্যাপারটাকে দাগিয়ে দিতেই যেন উন্মুখ ছিল আমাদের সমাজ।

আর ব্যক্তির স্তর থেকে সামাজিক স্তরে, কেবলই মনে পড়ে ঘৃণ্য সেই সব দৃশ্য, নোংরা ব্যবহৃত প্যাড টেনে নিয়ে যাচ্ছে কুকুরে, জমানো জঞ্জালের ভেতর থেকে ...মনে পড়ে মেয়েরা ট্রেনের মধ্যে এক মহিলাকে ঘিরে ধরেছে, যে মহিলা লজ্জায় অধোবদন তাঁর জীবনের বড় দুর্ঘটনাটি ঘটে গেছে বলে ...শাড়িতে দাগ লেগেছে ...মনে পড়ে কেয়ারফ্রি শব্দটাকে ঘিরে মেয়েদের চাপা হাসি, গুজগুজ। কেয়ারফ্রি-র বিজ্ঞাপন টিভিতে হলেই সবাই কাঁটা হয়ে ওঠে, মামা কাকা দাদাদের সঙ্গে বসে নাকি ওই বিজ্ঞাপন দেখা যায় না। আর, আমাদের চোখে ওইসব প্রোডাক্টও অসম্ভব বিলাসবহুল, দামি একটা জিনিস। প্রয়োজনীয় নয়, বরং শৌখিন বলেই ভাবা হয় তখনো ওদের। শৌখিন ও বেহায়া।

৯০-এর দশকে বাজার খুলছে, আমাদের দেশ বিশ্বকে বরণ করছে, আমাদের জীবনে ক্রমে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে উইস্পার শুধু নয়, আর পাঁচটা স্যানিটারি ন্যাপকিনও। হয়ে উঠছে অনিবার্য। তবু বিয়ার বা রামের বোতলের মতো কাগজে মুড়েই কিনতে হয় প্রোডাক্টটি। দোকানে অন্য পুরুষমানুষ থাকলে চেঁচিয়ে দোকানদারকে বলা যায় না, এক প্যাকেট উইস্পার দিন তো! মনে পড়ে, প্রেসিডেন্সিতে গিয়ে এ বিষয়ে ক্যান্টিনে বসে বলা গল্প শুনেছিলাম, কোনও এক ছেলে নাকি কলেজ ফেস্ট-এর সময়ে মেয়ে কলেজে গিয়ে একটি মেয়ের

সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে চেয়েছিল, কথা বলবার সময় আছে কিনা, তাদের ক্লাস চলছে কিনা, বলেছিল, আর ইউ হ্যাভিং ইয়োর পিরিওডস নাও? তারপর সেই মেয়েটির কী প্রক্রিয়াহয় সেটি কল্পনা করে আমরা গলা ফাটিয়ে হেসেছিলাম, কলেজের দাদা-দিদিদের সঙ্গেই। যদিও গল্পটা বলেছিল একটি ছেলে, কোনও মেয়ে সবার সামনে এমন জোক করলে তাকে সকলের অদৃশ্য সেনসরের মুখে পড়তে হত অবশ্যই। আসলে, মেয়েদের এসব নিয়ে কথা বলাটা বেহায়াপনা, কুরুচিকর, অসালীন...এখনো মধ্যবিত্ত আমাদের মনের তলদেশে এই চিন্তাটা কিন্তু রয়েই গেছে...অথচ সেই সময়েই কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ থেকে কিনে পড়তে শুরু করেছি জার্মেন গ্রিয়ারের দ্য ফিমেল ইউনাখ, যা পালটে দেবে আমার জীবন।

মনে পড়ছে সম্প্রতি এক স্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠানে গেছি, কিছু বক্তব্য রাখার ছিল সেখানে। নন্দীগ্রাম ঘটনার পর পর। তখন নানা 'সিভিল সোসাইটি' আলোচনা সভায় যাচ্ছিলাম, অনেক ডাক্তারবাবুরা যেহেতু উদ্যোগী হয়েছেন, দুর্গতদের সেবায় ফ্রি হেলথ্ ক্যাম্প করেছেন, সে সব সূত্রেই আমন্ত্রণ পেয়েছি। সে অনুষ্ঠানে বাংলা অ্যাকাডেমির সভাগৃহে অসংখ্য পুরুষ এবং বেশ কয়েকজন নারীর উপস্থিতিতে আমার খুব প্রিয় এক নারীবাদীনেত্রী স্যালুট করার মতো একটা কাজ করলেন। স্পষ্ট ভাষায় বললেন ঃ এখানে সবাই প্রাপ্তবয়স্ক, কাজেই বলতে পারি, স্বাস্থ্যচেতনার দিক থেকে আমাদের কৈশোর ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমার মা আমাকে আর আমার দিদিকে যে ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো দিতেন, ব্যবহারের পর সেগুলোকে ধুয়ে আবার আমরা মেলে দিতাম ছায়াতে, কারণ লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে হবে। এভাবে সেই সব ন্যাকড়ার ভেতরে কী পরিমাণ ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এটুকু বলতে পারি যে এই মিনিমাম স্বাস্থ্যচেতনাগুলো বাড়ানোটাই একটা বড় দায়িত্ব স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে আপনারা যাঁরা যুক্ত আছেন সেই সব ডাক্তারবাবুদের।

ওই নারীবাদী নেত্রীই বলেছিলেন, ওই অঞ্চলে ঘরছাড়াদের ক্যাম্পে গিয়ে তিনি দেখেছেন, মহিলাদের ক্ষোভ। এক বস্ত্রে ঘর ছেড়ে পালানো মেয়েরা অনযোগ করেছেন, যার কাছে পরনেরও একটা বত্রাড়তি কাপড় নেই, সে ঋতুর সময় কী করবে তা কি নেতারা ভেবেছেন? আনন্দবাজার পত্রিকায় সে সময়ে একটা খবরও দেখি এই নিয়ে। রাজনৈতিক নেতারা, স্বেচ্ছাসেবীরা অন্তত যদি এতটুকু সংবেদনশীল না হতে পারেন, যে খাবার, চাল ডাল, অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজীনয় সামগ্রী, ওষুধপত্র, একটা দুটো পোশাক বাদ দিয়েও, মেয়েদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিনের মতো জিনিসও ত্রাণ সামগ্রীর সঙ্গে পাঠানো উচিত, তাহলে আর কিসের ত্রাণ, কাদের জন্যই বা?

আবার এই কিছুদিন হল, খুব শোরগোল উঠেছে—গুজরাতের ভুজে এক কলেজে, শ্রী সহজানন্দ গার্লস ইনস্টিটিউটের হোস্টেলে ঘটনাটি ঘটে। জনা ষাটেক ছাত্রীকে বলা হয়, তাদের পিরিওড চলছে কিনা তা পরীক্ষা করা হবে অন্তর্বাস দেখে। কেন না হোস্টেলে পিরিওড চলাকালীন ছাত্রীদের রান্নাঘরে/খাবার ঘরে ঢোকা মানা, কিন্তু কেউ কেউ এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন করেছে; এই সন্দেহ থেকেই এ জাতীয় তালিবানি ফতোয়া। বলাই বাহুল্য কলেজটি একটি ধর্মীয় সংগঠনের পরিচালিত বলেই, তা নিয়ে হুলুস্থুল বাড়ে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই এক সাধুবাবার মন্তব্যও মিডিয়াতে ছড়ায়। তিনি বলেছেন, মেয়েরা ঋতুকালীন রান্না করলে বা রান্নাঘরে গেলে তারা পরজন্মে কুক্কুরি হয়ে জন্মায়। এর পর ফেসবুকে ভাইরাল হয় সুন্দর সুন্দর কুক্কুরির ছবি। অনেকেই বলেন, ঋতুকালে আমরা সবাই যে অসংখ্যবার রান্নাবান্না করেছি সেজন্যে সবারই ভবিতব্য এই। অনেকেই বলেছেন, যাক, এবার অন্তত মাসে কটা দিন রান্নাঘর থেকে নিস্তার। স্বামীরা এবার থেকে বলুক, ঋতুর কদিন তারা বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে খাবে!

ইদানীং আমাদের রোজকার জীবনে, কথাবার্তায়, বাচনে ঋতু নিয়ে কথা খুব সহজেই উঠে আসছে, এই ঘটনা আরো বেশি বেশি করে আমাদের কথনবিশ্বে প্রবেশ করিয়ে দিল মেয়েদের ঋতুর সেই 'অকথিত বাণী'। আমার ছোটবেলায় এসব চাপা থাকত এক নৈঃশব্দ্যের মোড়কে। রাস্তায় ঘাটে দেওয়াল লিখনে (বলাই বাহুল্য দেওয়াল লিখন পড়ে পড়েই আমার অনেক বাংলা শব্দ শেখা, বিশেষ করে স্বৈরতন্ত্রী বা স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীকে দাগিয়ে দেওয়ার দেওয়াল লিখন পড়ার পর অবধারিত মাকে 'ইন্দিরা গান্ধী স্বৈরিণী, মা?' বলে ফেলে বিশাল বকুনি খাওয়ার অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল!) ঋতু সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দেখলে আমি সদ্য পড়তে শেখার উল্লাসে, দিদিকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেতাম না। দিদি মুখ ঘুরিয়ে নিত। আমি জানতাম না শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত —ছয় ঋতুর বাইরে অন্য কোনো ঋতুর কথা।

আমার এগারো বছরের মেয়ের প্রথম ঋতুকালে তার বাবা তাকে এক ঘণ্টা ধরে বলেছিল, এসবে ভয় পাবার কিছু নেই।

জেঠতুতো দাদার সঙ্গে সে খোলাখুলি এই নিয়ে আলোচনা করত। আঠারো কুড়ি বাইশের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে দল বেঁধে বসে আছে, কোনও মেয়ে বলছে তার ঋতুজনিত ক্র্যাম্পের কথা, ছেলেরাও সে আলোচনায় অংশ নিচ্ছে, এ দৃশ্যও বিরল নয় এখন। এমনও শুনেছি অফিসের সহকর্মীদের কাছে কোনও মেয়ে বলছে, তার পিরিয়ডস-এর সময়ে ভীষণ ক্লান্তি মাথাধরা পেট ব্যথা হয়, সে সময় পুরুষ সহকর্মী যেন একটু হেল্প করে তাকে, তার কাজ তুলে দেয় খানিকটা।

এইটুকু এগিয়ে যাওয়াকে সত্যিই 'এগিয়ে যাওয়া' বলেই মনে হয় আজও। বাকি অনেক পেছিয়ে যাওয়ার পাশে। তবু প্রশ্ন থেকেই যায়। আমাদের সমাজে শিক্ষিত, প্রিভিলেজড, এগিয়ে থাকা পেশার কতগুলো পকেটেই তো আজকের দিনে এই খোলাখুলি একটা স্বাভাবিক, বৈজ্ঞানিকভাবে যা সুস্থতার লক্ষণ বলে প্রমাণিত সেই জৈবিক প্রক্রিয়াকে নিয়ে ছুঁৎমার্গটা চলে গেছে।

আসলে নারীর যৌনজীবন, নারীর যৌনতা, নারীর যোনি এবং অন্যান্য স্ত্রী অঙ্গ—সবই ট্যাবু বিষয়। আজও আমার স্মৃতিতে অমলিন, যতদূর মনে পড়ে, আশির দশকে দেখা তপন সিংহ পরিচালিত ছবি, এক ডক্টর কি মৌত-এর এক দৃশ্য। বৃদ্ধ, স্থবির, ভয়ানকভাবে এককাট্টা, নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার বিরোধী ডাক্তাররাতরুণ নায়ককে বলে উঠেছিলেন, আপনার এত বড় সাহস আপনি মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন। সবাই জানে মেয়েদের জরায়-টরায়ু মিলিয়ে একটা কমেপ্লক্স বিষয়, অতি দুর্বোধ্য, ওইসব নিয়ে কথা বলার আপনার দরকার কি। আমরা জানি ইন-ভ্রিো-ফার্টিলাইজেশনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য সত্যিই ডাক্তারবাবু সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে কীভাবে হেনস্থা হতে হয়েছিল। যার পরিণাম—মৃত্যু।

যে কোনও নিষিদ্ধ বিষয়ের চেয়েও বেশ কয়েকগুণ নিষিদ্ধ এই বিষয়গুলো। আজও, নতুন করে বিষয়টি সামনে আসায়, এক দল মেয়ে স্তম্ভিত ও ক্রুদ্ধ। যাঁরা অনেক পরিশ্রম করছেন ঋতু, জরায়ু ইত্যাদি নিয়ে মিথগুলো ভাঙতে, নীরবতার পর্দা তুলতে। অন্যরা, বাকিরা? কী ভাবছেন তাঁরা? এগিয়ে আসুন। আলোচনা হোক। কোনদিন কি আদৌ আসবে, যেদিন কোনও শ্রমজীবী নারী বলতে পারবেন মুখ ফুটে, পরজন্মে কুক্কুরী হবার ভয়ে না, আমার এই পাথর ভাঙার কাজ বা রাশি রাশি কাঠ বয়ে এনে উনুন ধরানোর কাজ আমি ঋতুজনিত ক্লান্তির কারণেই করতে পারছি না, আমাকে একটু সাহায্য কর, পুরুষ!

উমা

বিজ্ঞান বিশ্বাসনির্ভর নয় পরীক্ষানির্ভর কিন্তু বাস্তুবিদ্যা?

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

সম্প্রতি ডারউইনের বিবর্তনবাদ পাঠ্যসূচি থেকে ছেঁটে ফেলার ধুম পড়েছে দেশজুড়ে। অথচ বিবর্তনের মূল ভিত্তি হল ধারাবাহিকতার পথে উত্তরণ। ডাইনোসর যেমন একদিনে শেষ হয় নি, তেমনই বাঁদরও একদিনে মানুষ হয়ে ওঠে নি। প্রাণীজগতে এমন বিবর্তন যেমন সত্য তেমনই সমাজজীবনে শিক্ষালাভের বিবিধ পথ এবং প্রকরণেও সেটি সত্য। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব নস্যাৎ করতে গিয়ে দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রির সটান জবাব যে তিনি তাঁর শৈশববেলা থেকে অদ্যাবধি মা-ঠাকুমার গাওয়া গানে কখনও বাঁদর থেকে মানুষ হওয়ার কাহিনী শোনেন নি। ব্যাস, যেমন কথা তেমন ভাবনা, আর সেই মতো কাজ! ফলে বোঝা যাচ্ছে দেশের শাসকের সত্যি কথার চেয়ে শোনা কথায় বিশ্বাস ঢের বেশি। আর এমন বিশ্বাস নির্ভর পথেই তাঁরা দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে থাবা বসাতে চাইছেন বিশ্বাস নির্ভর দেশ গড়তে। কার্যত এক সুপরিকল্পিত পথে দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে ছোট-বড়-মেজ-সেজ নেতাদের দল বিজ্ঞান প্রযুক্তির বুনিয়াদি যুক্তিবাদী ধারণার মূলে আঘাত হানতে চাইছেন। ফলে দেশ চালনার ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব পড়ছে এখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ভাবনার ক্ষেত্রেও। ফলে মুখে আত্মনির্ভর দেশ গড়ার কথা উচ্চারিত হলেও সেই স্বনির্ভর বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হতে চলেছে ধর্মীয় মৌলবাদী ভাবনার অনুপ্রবেশে।

একথা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিজ্ঞানবিশ্বাস নির্ভর নয় বরং তা পরীক্ষানির্ভর এবং যুক্তিনির্ভর পথের সন্ধান দেয়। পাশাপাশি এটাও ঠিক যে বিজ্ঞান এখনও অবধি আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা যাবতীয় অজানা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ কারণ বিশ্লেষণ করে উঠতে পারে নি। কিন্তু তাই বলে সেই অজানাকে অন্বেষণের পরীক্ষানির্ভর পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী এবং যুক্তিবাদী মানুষেরা। ফলে অজানার খোঁজে সত্য অন্বেষণের পথে কখনোই নয় অন্ধবিশ্বাস নির্ভর হতে পারে না। বরং পৃথিবী জুড়েই স্বীকৃত যাচাইয়ের পথ, পরখের পথই হচ্ছে অচেনাকে জানার বস্তুবাদী পথ। এভাবেই ইতিহাসের পথ

বেয়ে এগিয়েছে বিজ্ঞানের ইতিহাস। কিন্তু এমন বস্তুবাদী এবং যুক্তিবাদী পথ চলার দর্শন যখন উপেক্ষিত হয় সরকারিভাবে তখন দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে নেমে আসে অন্ধকার। কার্যত সেই অন্ধকারের আবহে এখন শুরু হয়েছে এদেশের জনজীবনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে বাঁচানোর লড়াই। পৃথিবীর বহু দেশেই বিজ্ঞান যখন রাজশক্তি বা ধর্মীয়শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে, তখনই ব্যাহত হয়েছে তার স্বাভাবিক অগ্রগতি। গ্যালিলিও, আর্কিমিডিস বা আইনস্টাইনদের প্রত্যেকেরই জীবন প্রমাণ করে বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশে মুক্ত চিন্তার প্রয়োজনকে।

দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী প্রত্যেকেই এখন এ দেশের প্রযুক্তির গৌরবগাঁথা তৈরি করছেন পৌরাণিক ও ধর্মগ্রন্থের উপাদানকে সঙ্গী করেই। যেমন গণেশ হিন্দুদের দেবতা, তার মাথায় হাতির শুঁড় প্রমাণ করে প্রাচীনকালে হিন্দু ডাক্তারেরা প্লাস্টিক সার্জারি জানতেন। তাঁরা একথাও প্রচার করছেন যে মানব সভ্যতার আদিমতম বিমান পুষ্পক রথের প্রথম সওয়ারি ছিলেন স্বয়ং রাজা রামচন্দ্র। এমনকি প্রাক্তন এক শিক্ষামন্ত্রী আরও এক ধাপ এগিয়ে দাবি করেছেন যে, 'জ্যোতিষ শাস্ত্রই হল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।' ফলে দেশে এখন নতুন করে জ্যোতিষ চর্চার গবেষণায় জোর পড়বে বলেই আশঙ্কা। সমস্যা আরও বেড়ে চলবে, যখন জ্যোতিষকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়ে মানুষ মাদুলি-কবচ-হস্তরেখা দিয়ে বুঝবেন জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ, দলিতেরা বুঝবেন কেন তারা সমাজে অস্পৃশ্য, মহিলারা বুঝবেন কেন তাদের হতে হবে অসূর্যম্পশ্যা, বেকার কেন বুঝবে তারা নিষ্কর্মা! যেমন বাস্তুবিদ্যার মোড়কে পেশ করা হচ্ছে বাস্তু শাস্ত্রের বহু প্রকরণ। বলা হচ্ছে সেই বাস্তু শাস্ত্রের দেশীয় নিদান নাকি এদেশের সুপ্রাচীন আবিষ্কার, যে 'আবিষ্কার' হল হিন্দুদেরই সৃষ্টি। অতএব হিন্দু সংস্কৃতির এমন 'ছাইচাপা জ্ঞানের উন্মেষ' ঘটাতে হবে দেশ জুড়ে বিজ্ঞানের মোড়কে। আর সেক্ষত্রে দেশের বর্তমান গেরুয়া সরকারের বদান্যতায় এমন প্রাচীন বহু অপ্রমাণিত শাস্ত্রীয় নিদানকে শিক্ষা সূচির অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে দেশের নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির আড়ালে। ইতিমধ্যে প্রযুক্তি পাঠের অন্যতম উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠান আই আই টি খড়গপুরে স্থাপত্য শিক্ষার সূচিতে স্থান পেয়েছে 'বাস্তু' পাঠের শিক্ষা। আর দেশের নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতিতে উচ্চশিক্ষায় 'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম' নামে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাস্তুপাঠের শিক্ষা শাস্ত্র সম্মত হলেও সেটি বিজ্ঞান সম্মত কতখানি সেটা প্রমাণের আগেই প্রযুক্তি পাঠের সিলেবাসে ঢুকে পড়ছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। ইতিমধ্যে কর্ণাটকের মতো রাজ্যে কেন্দ্রীয় পূর্ত নিগমের (CPWD) উদ্যোগে স্থপতি এবং বাস্তুকারদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে যাতে তাঁরা বাস্তুসম্মত নির্মাণ নির্বিঘ্নে করতে পারেন। এমনকি সেই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী আপাতত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে সেই বাস্তু পাঠের সুযোগ বিভিন্ন কলেজগুলিতে চালু করবেন এমন দাবি করেছেন। দেখার বিষয় রাজ্যে সাম্প্রতিক সরকার পরিবর্তনের পর সে রাজ্যে বাস্তুশিক্ষার নীতি পরিবর্তন হয় কি না? কারণ বাস্তুশিক্ষার মধ্যেকার অন্তর্নিহিত বিপদ কেবল স্থাপত্যবিদ্যা পাঠে আটকে থাকে না, সেই বিশ্বাসনির্ভর পাঠের বিপদ শিক্ষার সব শাখাতেই প্রসারিত হতে থাকে। যে কারণে প্রকাশ্যে সেই রাজ্যেই খুন হতে হয়ে যেতে হয় যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতা ডঙ্গ কালবুরগি কিংবা গোবিন্দ পানসারে অথবা গৌরী লঙ্কেশের মতো মানুষদের।

এখন এদেশের ধর্মীয় মৌলবাদীদের নতুন কৌশল হচ্ছে বিজ্ঞানের মোড়কে ছদ্ম বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। কারণ দেশের লেখাপড়ার সার্বিক অগ্রগতির এই যুগে বিজ্ঞানকে পুরোপুরি অস্বীকার করা জনসমক্ষে কঠিন। তাই তুলনায় সহজ বিজ্ঞানের মোড়কে ধর্মীয় শাস্ত্রীয় ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটানো। সেই প্রেক্ষিতেই যেমন চলে আসে মহাভারতের কর্ণের মাতৃগর্ভের বাইরে জন্মের রহস্য মোচনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর 'সারোগেট মাদার'-এর সম্পর্ক কিংবা বিমান চলাচলের দেশীয় কৃতিত্ব দাবির লক্ষ্যে রামায়নের 'পুষ্পক রথে'র সম্পর্ক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-র ধ্বনি তোলা দেশের নেতা মন্ত্রীরা কেউ ভুলেও সেই সব দাবির পক্ষে আন্তর্জাতিক মঞ্চে কোনও প্রমাণ পেশ করার পথে হাঁটছেন না। নিউটনের বহু আগে ব্রহ্মগুপ্ত অভিকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন বলে সংবাদমাধ্যমে দেশের মন্ত্রীরা বিবৃতি দিয়েই খালাস। কিন্তু কেউ দেশীয় বিজ্ঞানের এই গৌরবগাথা প্রতিষ্ঠার পথে হাঁটছেন না, কারণ তাঁরা নিজেরাও জানেন তাঁদের মতামতের বৈজ্ঞানিক কোনও ভিত্তি নেই। অপরীক্ষিত সত্য আর বিশ্বাস নির্ভর ভাবনাকে উচ্চশিক্ষার প্রামাণ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনার প্রচেষ্টা শেষমেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিকাশের অধোগতিকেই নিশ্চিত করবে।

অথচ এর মানে এই নয় যে, সুপ্রাচীন আমাদের ভারতীয়

সভ্যতায় বিজ্ঞান প্রযুক্তির গর্ববোধের উপাদান কিছু কম ছিল। গণিত থেকে শুরু করে চিকিৎসাবিজ্ঞান কিংবা নির্মাণ প্রযুক্তি, নগর পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ধাতুবিদ্যা, আয়ুর্বেদ এমন বহু ক্ষেত্রেই উৎকর্ষ কেন্দ্র ছিল ভারতীয় উপ মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো নগর পরিকল্পনা স্থাপত্য ক্ষেত্রে কোনারক-এর সূর্য মন্দির, কুতুবমিনার, তাজমহল, সোমনাথ মন্দির, যন্তর-মন্তর নামগুলো প্রথমেই মনে পড়ে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সময়কালের সেই উৎকৃষ্ট জ্ঞান ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্বাচিত কিছু ধর্মীয় শাস্ত্রের নিদান কিংবা রূপকথার কল্প গল্পের উপাদানকে বিজ্ঞান প্রযুক্তির উৎকর্ষ হিসাবে চালানোর রাষ্ট্রীয় তৎপরতা এখন শুরু হয়েছে। এমন তৎপরতার মূল কারণ কেবল হিন্দুদের ইতিহাস,কেই দেশীয় সাফল্যের জয়গাথা হিসাবে তুলে ধরা। হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন নিদানকে দেশীয় প্রযুক্তির উৎকর্ষ হিসাবে তুলে ধরা। আর এমন ধর্মীয় বিভাজনের গৌরবগাথা বানিয়ে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় চরিত্রের বিসর্জন ঘটিয়ে ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের পথে হাঁটা। আর এখানেই তৈরি হয় বিজ্ঞানের সাথে অবিজ্ঞানের সংঘাত। দেশের সরকার যদি অবিজ্ঞান কিংবা ছদ্ম বিজ্ঞানের বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে তখন সমাজ জুড়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে থাকে। মনে রাখা উচিত যে বিজ্ঞানের প্রভাব কেবল পরীক্ষাগারে কিংবা ক্লাসরুমে আবদ্ধ থাকে না, সেই বিপদের ধাক্কায় কুপোকাত হতে হয় একুশ শতকে চলা কোটি কোটি মানুষের জীবন। যে অবিজ্ঞানের, কুসংস্কারের হাত থেকে রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের মতো মানুষেরা বের করে এনেছিলেন দেশের মানুষকে সেই কষ্টার্জিত অগ্রগতি আবার উল্টোপথে ছুটবে এমন অবিজ্ঞানের আবহে।

এ ক্ষেত্রে অবিজ্ঞান-ছদ্মবিজ্ঞান আর বিজ্ঞানের মধ্যেকার বিভাজন আজ বোঝা ভীষণ প্রয়োজন, সহজ ভাষায় যে আবিষ্কারকে দেশের শাসক অথবা তাদের স্বেচ্ছাসেবক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের দল পৃথিবীতে স্বীকৃত প্রথায় জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারেন অথবা না জানেন, সে ক্ষেত্রে সেই সব আবিষ্কার বা মূল্যায়নকে দেশের পাঠ্যসূচি বা শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান না দেওয়াটাই সমীচীন। পৃথিবীর উন্নত সভ্য দেশে এ নিয়ম চালু থাকলেও এ দেশে সরকারি ক্ষমতাকে ব্যবহার করে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই অবিজ্ঞানকে শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থান দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞান ও সমাজকে বিচ্ছিন্ন করার ভয়াবহ বিপদটা শুরু হয় এখান থেকেই। এখানেই প্রয়োজন এ দেশে ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবনার ভিত্তিতে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ।

এদেশের বাস্তু শাস্ত্রের সংখ্যা একটা নয়। ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন সময়কালে এমন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতারা ছিলেন বরাহমিহির থেকে শুরু করে ভৃগু কিংবা মনসারা। ফলে এমন বাস্তু শাস্ত্রগুলিতে উল্লেখিত বিভিন্ন নিদানের কথা প্রস্তাবিত হয়েছিল সমসাময়িক স্থাপত্য ভাবনার কিছু রূপরেখার ভিত্তিতে। বিশেষত এমন বাস্তু ভাবনা সময়ের মাপকাঠিতে নির্ভর করত তৎকালীন জলবায়ু, নির্মাণ সামগ্রী এবং সমসাময়িক সামাজিক বহু প্রথার ওপরেও। ফলে এমন ভিন্ন ভিন্ন বাস্তু শাস্ত্রের বহু বিধি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ফলে এমন শাস্ত্রের যাবতীয় বিধি যে বিজ্ঞানসম্মত ছিল একথা আদৌ প্রমাণিত সত্য নয়। কিন্তু যে বিধিগুলিতে বিজ্ঞানের ভিত্তি ছিল সেগুলিরও কালের নিয়মে বিবর্তন ঘটেছে বিজ্ঞান প্রযুক্তি গবেষণার পথ ধরেই। ফলে হাজার বছরের পুরনো নিদানকে এখন ধ্রুবসত্য মনে করে আঁকড়ে থাকাও অর্থহীন। যেমন বাস্তু বিধি মেনেই আদিকাল থেকেই বাড়িতে 'cross ventilation' নিশ্চিত করার জন্য সরলরেখার মতো লম্বা লম্বা দেওয়ালের বিপরীত মুখী দরজা জানলার অবস্থান ঠিক করা হত। এমন বিধি, বাড়িতে বায়ু চলাচলের জন্য বিজ্ঞানসম্মত কিন্তু আধুনিক ফ্ল্যাট বাড়ির প্রতিটি দেওয়াল বরাবর মুখোমুখি দরজা জানলা যে স্থান সংকোচের কারণে বসানো সম্ভব নয়। ফলে সেক্ষেত্রে কি মানুষ সেই ফ্ল্যাটে বাস করবে না? আধুনিক কালে বায়ু চলাচলের জন্য যান্ত্রিক বাতানুকূল ব্যবস্থার দাপটে 'ক্রস ভেন্টিলেশন'-এর পরিবর্তে জানলা ছাড়াই হোটেল রেস্তোরাঁ সেমিনার রুমের ঘর, প্রেক্ষাগৃহ রমরমিয়ে চলছে।

কিন্তু বাস্তুশাস্ত্রের যে নিদানগুলি আজকের দিনে অর্থহীন কিংবা অপ্রমাণিত সেগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। যেমন বাস্তুর বিধানে বলা রয়েছে বাড়ির পশ্চিমে জলাশয় অবস্থিত হলে সেই বাড়ির আবাসিকদের দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হবে। তাহলে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠবে এদেশের বাণিজ্য নগরী মুম্বাইয়ের পশ্চিমে রয়েছে আরব সাগর। সেই যুক্তিতে আর্থিকভাবে ভয়াবহ দুর্বল হওয়ার কথা ছিল পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত মুম্বাই থেকে তিরুবন্তপুরম প্রতিটি শহর শহরতলির, কিন্তু বাস্তবতা একদম উল্টোটাই প্রমাণ করছে। একইভাবে বাস্তু

নিদান অনুযায়ী বাড়ির মূল প্রবেশদ্বার উত্তরমুখী হলে অতীব শুভ। কারণ বাড়িতে শুভ শক্তির প্রবেশ নাকি সে পথেই ঘটে! সেই যুক্তিতে যে কোনও রাস্তার একদিকের বাড়িগুলি উত্তরমুখী হলে রাস্তার উল্টোদিকের বাড়িগুলি বিজ্ঞানের নিয়মে দক্ষিণমুখী হতে বাধ্য। আর বাস্তু বিধি অনুযায়ী সেই দক্ষিণমুখো বাড়িগুলো অশুভ শক্তিবাহী হলে যাবতীয় নির্মাণ রাস্তার একধারে হবে আর বাকি দিক থাকবে ফাঁকা। কিন্তু আজকের বাস্তবতা কি একথা প্রমাণ করে দক্ষিণমুখো বাড়ির বাসিন্দারা সদলবলে অশুভ শক্তিতে আক্রান্ত হচ্ছেন? হাল আমলে নগর পকিল্পনায় বৃত্তাকার 'রিং রোড' তৈরি হচ্ছে গাড়ির চাপ কমাতে। কিন্তু বিজ্ঞানের নিয়মে বৃত্তের পরিধি বরাবর বাঁয়ে ডায়ের জমির প্লটের কৌণিক অবস্থান নিরন্তর পরিবর্তনশীল। ফলে সেখানে বাড়িতে প্রবেশ দ্বারের উত্তর-দক্ষিণের বিচার করে শুভ-অশুভ স্থির হবে কোন যুক্তিতে সেটা বোঝা দায়। পৃথিবীর অন্যতম দাপুটে দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের অন্যতম একটা দরজা দক্ষিণমুখী। তাতে কি আমেরিকার দাপট কোনও অংশে কমেছে গত সাত দশক জুড়ে? আসলে শুভ-অশুভ কিংবা সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের সাথে বাড়িঘরের জ্যামিতিক আকার, দরজা জানলার অবস্থান কিংবা জমির প্লটের আকারের পারস্পরিক সম্পর্ক যেভাবে বাস্তু শাস্ত্রে প্রস্তাবিত হয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এছাড়া তথাকথিত বাস্তু নিদান নিয়ে বিতর্কের উপাদান ভুরি ভুরি। বাস্তু নিদানে রাতে খাওয়ার পর ব্যবহৃত থালা বাসন মেজে না শুলে আবাসিকেরা আর্থিক সমস্যায় জড়িয়ে পড়বেন। ভেবে দেখুন, এ দেশের কোটি কোটি মানুষ রাতে নয় সাধারণত দিনের আলোয় বাসন মাজেন। তাই বলে তাঁরা সবাই আর্থিকভাবে বিপন্ন হচ্ছেন? এদেশের বাস্তু শাস্ত্র যখন লেখা হয়েছিল তখনও পৌরসভা কিংবা নগর পরিকল্পনার আধুনিক রূপ তৈরি হয় নি। ছিল না তখন 'exhaust fan'। ফলে বাস্তু বিধি অনুযায়ী বাড়ির রান্নাঘর যদি বাড়ির এক কোণে বায়ু প্রবাহের দিক বরাবর অবস্থিত হয় সেটা কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু তাই বলে আধুনিক প্রযুক্তির যুগে শিল্পের প্রয়োজনে 'বয়লার' রুমের অবস্থান বাস্তু মেনে নির্ধারিত হবে, রান্নাঘরের ফর্মুলায় সেটা হবে হাস্যকর। ফলে একদা যে বাস্তু বিধি স্বল্প উচ্চতার বাড়িতে মানার চল ছিল এখন ধীরে ধীরে সেই শাস্ত্রীয় ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটছে কর্পোরেট সংস্থার আবাসন থেকে পরিষেবা এবং শিল্প প্রকল্পে। সেই বাস্তু অনুসারী ভাবনায় আর্থিক লাভ-ক্ষতি, শুভ-অশুভের যাবতীয় কারণ হিসাবে মানুষের বাসস্থানের আকার আকৃতি সাজসজ্জা তুলে ধরা হচ্ছে। বিপদের ভাবনা সেখানেই। জ্যোতিষীরা যেভাবে মানুষের হাতের রেখা বিচার করে প্রেম-বিবাহ, জন্ম-মৃত্যু, চাকরি-ব্যবসা সবেতেই ভাগ্যকে জুড়ে ফেলেন, প্রয়োজনে দুর্ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে গ্রহ-রত্ন কিংবা যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা করে থাকে, ঠিক এক কায়দায় বাস্তু দোষ কাটাতে ধর্মীয় যজ্ঞ এবং কিছু উপাচারের নিদান দিয়ে থাকেন শাস্ত্রীয় পণ্ডিতেরা। আর এভাবেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাথে সাথে উচ্চারিত হচ্ছে বাস্তু শাস্ত্রের কথা। আর দেশের বর্তমান শাসক প্রবল দাপটে 'Indian knowledge system'-এর অংশ হিসাবে শিক্ষা সূচিতে এমন সব অপরীক্ষিত বিষয়গুলিকে বিজ্ঞান হিসাবে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বাস্তু নিদানে বলা হচ্ছে ঘরে গণেশের মূর্তি রাখতে। এমনকি সেই মূর্তির শুঁড় হবে বাঁদিকে ঝুঁকে থাকা। কিন্তু বাস্তু বিদ্যা যদি বিজ্ঞান হয় তবে কলকাতাতে যতটা সত্যি ঠিক ততটাই সত্যি ক্যালিফোর্নিয়াতে। কিন্তু সুদূর আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর কাছে গণেশ মূর্তি অচেনা এবং অজানা বস্তু বলেই সে দেশে গৃহের সুখ শান্তি নিশ্চিত করার জন্য কোন মূর্তি ঘরে রাখবে তার কোনও উত্তর মেলে না এমন বাস্তু নিদানে।

পাশাপাশি ঘরের আসবাবের ওপর নির্ভর করবে নাকি সংসারের সুখ-শান্তি, প্রেম-বিচ্ছেদ, রোগ-ব্যাধি কিংবা জমির আকৃতির ওপর নাকি নির্ভর করবে বাসিন্দার সরকারি হয়রানির পরিমাণ, এমন তত্ত্ব হজম করা কঠিন এই কলিযুগে। গত কয়েক বছরে রাজ্যে কিংবা দেশে সরকারি হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন মানুষেরা কি কেবল তিন কোণা প্লটের বাসিন্দা? বাড়িতে ক্যাকটাস জাতীয় গাছ ফুলের টবে রাখা বিপদের, এমন দাবি উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা না করলেও করেছে বাস্তু বিশেষজ্ঞরা। কিংবা মহাভারতের যুদ্ধের ছবি ঘরের দেওয়ালে লাগালে নাকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে, এমন বাস্তু নিদান থাকলেও তার কারণ ব্যাখা নেই কোথাও! একইভাবে তাজমহলের ছবি রাখাও নাকি ঘোর অশুভ, কারণ সেই মহল নাকি প্রেমের নিদর্শন নয় সে হল শোকের প্রতিচ্ছবি। আসলে শোবার ঘর থেকে বসার ঘরে রাখা ছবি কিংবা ফুলের টব কিভাবে মানুষের জীবন জীবিকা, শিক্ষা স্বাস্থ্যের মতো সুখদুঃখের উপকরণগুলিকে প্রভাবিত করে সেই ব্যাখ্যা বাস্তু বিদ্যার আনাচে কানাচে মেলা ভার! এমন অগুনতি অপ্রমাণিত

নিদানকে ছদ্মবিজ্ঞানের মোড়কে আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে এক হ-য-ব-র-ল শিক্ষার আয়োজন চলছে দেশ জুড়ে। তার তার প্রয়োগের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে দেশ জুড়ে বেড়ে ওঠা নির্মাণ ক্ষেত্রের বাজারকে। এভাবেই কর্পোরেট বাণিজ্যের সাথে ধর্মীয় ভাবনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাস্তু বিদ্যার মিলন ঘটছে সরকারি উদ্যোগে। আর এমন ধর্মীয় ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটানোর লক্ষ্যে দেশজুড়ে চালুর চেষ্টা হচ্ছে 'বৈদিক গণিত' থেকে শুরু করে 'বৈদিক বিজ্ঞানে'র পাঠ। দুঃখের এবং আশ্চর্যের হলেও এটা ঠিক সমাজের একাংশের তথাকথিত ডিগ্রিধারী মানুষও এ সবকে বিশ্বাস করে চলেছে আজও। এই প্রেক্ষিতে নতুন প্রজন্মকে যুক্তিবাদী ভাবনার ভিত্তিতে সচেতন করে তুলতে প্রয়োজন আরও বৃহত্তর সামাজিক উদ্যোগ। অন্যথায় পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেও পিছিয়ে থাকতে হবে এ দেশকে আরও কয়েক দশক।

উমা

বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বপরিবেশ

প্রনবেশ সান্যাল

রাশিয়ার সাথে হঠাৎ ইউক্রেনের দানবিক যুদ্ধ আজ সকলকেই মহাযুদ্ধের কথা মনে করাচ্ছে। কিন্তু শস্য শ্যামলা দেশ ইউক্রেনের ওপর অতবড় দেশ রাশিয়ার কেন নজর পড়ল। তাহলে আমাদের ফিরে যেতে হয় ১৯৯২ সালের রিও সম্মেলনে নেওয়া মরুভূমির অগ্রগতি বন্ধ করার ট্রিটি বা সিদ্ধান্ত নেওয়া। পরিবেশে প্রকৃতির আপন খেলার বিরোধিতা করা খুব সাবধানে করতে হয়। সে সময় শুরুশুরুতে অনেক দেশই ডেসার্টিফিকেশান্ রুখবার বিপুল প্রচেষ্টা শুরু করেছিল। আমরাও থর মরুভূমিকে গাছ লাগিয়ে বনভূমি করে আয়তন কমানোর চেষ্টা করেছি। ভাকরা-নাঙ্গাল থেকে খাল কেটে চাষবাস করেছি। তার ফলে ভারতের মৌসুমী বায়ুকে দিশাহারা হতে হয়েছে। রাশিয়াতেও বিস্তীর্ণ কোল্ড ডেসার্টকে চাষের উপযুক্ত করতে অমুদরিয়া আর শিরাদরিয়া নদীদের জল বিপুলভাবে ব্যবহার করেছে। এতে মৌসুমী বায়ু এলোমেলো হয়ে গিয়েছে, নির্ধারিত প্রেসিপিটেশান্ ব্যাহত হচ্ছে, আরব সাগর হয়ে উঠছে আরও নোনতা। আশপাশের জমিগুলোও লোনা হয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে ফসলে টান পড়েছে। এবার তাই শস্যশ্যামলা ইউক্রেনের দিকে কুদৃষ্টি পড়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়াত অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আবহাওয়াবিদ দুর্গাদাস সরকারের অভিমত এই সূত্রেই গাঁথা আছে।

শিল্পবিপ্লবের পর বাতাসে গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়েই চলেছে, বেড়েছে শতকরা ৩১ ভাগ; তার ফলশ্রুতি হল খুব তাড়াতাড়ি আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠা। সে কারণে জলাশয়গুলো বাষ্প হয়ে শুকিয়ে যায়। আবার সেই বাষ্প বাতাসকে আরো গরম করে। সারা বিশ্বের মানুষ তাই মোকাবিলার জন্যে যথাসম্ভব সমবেত চেষ্টা শুরু করল।

৫ জুন ১৯৭২-এ সুইডেনের স্টকহোলম্ শহরে বিশ্বের ১১৪টি দেশের ডেলিগেট্ আলোচনা করেছিলেন বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে। অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও বিশ্ব তাপায়নের ব্যাপারটা যথোচিত গুরুত্ব পায় নি। তবে এই দিনটিতেই প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালিত হয়। এরপর আন্তর্জাতিক পরিষদ United Nation আফ্রিকার নাইরোবিতে ইউ এন ই পি প্রতিষ্ঠিত করে। এরা বিশ্ব পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যার দিকে নজর রাখতে শুরু করল।

প্রথম বিশ্ব আবহাওয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে ১৯৭৯ সালে। সেখানেই বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধির সাথে জীবাশ্ম জ্বালানি এবং ব্যাপক বন ধ্বংসের সম্বন্ধ বিশেষভাবে জ্ঞাত হল।

এরপর ১৯৮৮ সালে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) এবং (UNEP) মিলে প্রতিষ্ঠা করল (IPCC) অর্থাৎ ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ, যারা ২০০৭ সাল পর্যন্ত চারটি রিপোর্ট দিয়েছে। এইগুলোতে বিশ্ব আবহাওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। যেমন, মেরু অঞ্চলের এবং হিমালয় প্রমুখ তুষারাবৃত পাহাড়ের হিমবাহ অনেকটাই গলে গিয়ে সমুদ্রতলের উচ্চতা দ্রুত বাড়াতে থাকবে। তাছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাগরের জল দ্রুত ফেঁপে উঠে সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়ায়। ঝড়ঝঞ্ঝার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। হয়ত যে হারে গঙ্গোত্রী হিমবাহ গলে যাবে বলা হয়েছিল তত তাড়াতাড়ি গলে

নি। তাই এই সব ভবিষ্যৎবাণী সম্বন্ধে বিভিন্ন মহল থেকে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এজন্যে কনভেনশন অফ পার্টিস বা কোপ (COP) ১৭-তে জোহান্সবার্গে সম্মেলন করে যথেষ্ট আলোচনা ও সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তা মোটেই ফলপ্রসু হয় নি। আমরা এখন অক্টোবরে প্যারিসে (COP) ২১-এর ফলাফলের ওপর চোখ রাখি। সেখানে দেখা গেল চীন বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনে এক নম্বরে, আর আমেরিকা, ভারত আছে তার পরেই। ঠিক হল যে সবাইকে (অর্থাৎ ১৯৬টি দেশকে) বিশ্বের গড় তাপমাত্রা প্রি-ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল তাপমাত্রার থেকে দেড় থেকে ২ ডিগ্রির মধ্যে রাখতে হবে। এভাবেই বিশ্ব-তাপায়ন সমস্যার মোকাবিলা করা হবে।

যাই হোক, আমরা এবার ফিরে যাই ১৯৮৮ সালে যখন টোরান্টো শহরে সম্মেলন হল (The Changing Atmosphere: Implication for Global Security)। সেখানে সবাই মিলে ঠিক করল যে বিশ্বের কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ কমাতে হবে। এর নাম দেওয়া হল টোরান্টো টার্গেট, যা ২০০৫ সালের ভেতরেই কার্যকরী করা হবে। এখানে আরো বলা হল যে, ব্যাপক বন নিধনকে কড়া হাতেই রুখতে হবে। উন্নত দেশগুলিতে বেশি পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর জন্যে কার্বন ট্যাক্স দিতে হবে। ঐ বছরই সাউথ প্যাসিফিক ফোরাম-এ ঠিক করা হল যে তাদের দ্বীপগুলো বড় ঝড়ঝঞ্ঝার এবং সাগরতল দ্রুত ওপরে ওঠার ফলে ডুবে যাচ্ছে। প্রায় ৫,০০,০০০ মানুষ এভাবে আবহাওয়া-উদ্বাস্তু বা Climate Rufugee হতে চলেছে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল যে আমাদের সুন্দরবনেও ৭০০০ পরিবার এই রকম Climate Refugee হয়েছে। তারা ঘোঁরামারা, লোহাচরা এবং সুপুরিভাঙ্গা দ্বীপগুলোর অধিবাসী। আমাদের দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জও এই ডুবে যাওয়ার ভয়ে ভীত।

তারপর ১৯৯২ সালের ৫ জুন ব্রাজিলের রাইয়ো ডি জেনিরোতে উদযাপিত হল সুবিখ্যাত বিশ্ব সম্মেলন (United Nations Conference on Environment and Development - UNCED)। সেখানে ১৭৮টি দেশ একত্রিত হয়ে ঠিক হল যে, ২০১০ সালের মধ্যে সকলে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদন ১৯৯০ সালের মাত্রায় নিয়ে আসবে। আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া এতে সই করে নি। এখানে অনুন্নত এবং উন্নতিশীল দেশগুলো সোচ্চার হয়েছিল উন্নত দেশগুলির বিরুদ্ধে। ঠিক হল উন্নত দেশগুলি তাদের জি ডি পি-র শতকরা ০.৭ ভাগ অনুন্নত এবং উন্নতিশীল দেশগুলোর জৈব বৈচিত্র্য রক্ষার্থে ব্যয় করবে। তাহলে সেখানকার বিপুল প্রাকৃতিক অরণ্য সম্পদ রক্ষা পাবে। সেই অরণ্য থেকে আহরিত জৈব বৈচিত্র্য বিশ্ববাসীর কাজে লাগবে। এভাবে তারা যত সবুজায়ন করতে পারবে বা তাদের কলকারখানায় যত কম কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদন করবে তার জন্য কার্বন ক্রেডিট বাবদ অর্থ পাবেন।

রায়োতেই আরো দুটি চুক্তি বা ট্রিটি সাক্ষরিত হয়। একটি হল জৈব বৈচিত্র্য রক্ষার্থে আর অপরটি হল মরুভূমির প্রসার রুখতে। এইখানেই তৈরি হল অ্যাজেন্ডা-২১, যার ভেতরে একবিংশ শতাব্দীর নানাবিধ পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মতালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা ছাড়াও মহাসাগর, সাগর এবং উপকূল সুরক্ষা করার কথা রয়েছে। এ ব্যাপারে রূপ দেওয়ার জন্যে উন্নত দেশগুলি উদ্যোগী হয়। প্রথম Conference of Parties (COP-1) সম্মেলন হল ১৯৯৫ সালে ব্রিটেনে। এরপর অনেকবার সকলে মিলিত হয়েছে কোপ ১৭ পর্যন্ত, কিন্তু সারা বিশ্বেই এত অর্থনৈতিক টালবাহানা চলছে যে, ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে পরিবেশের বিপর্যয় নিয়ে কেউই একমত হতে পারছে না। আপাতত বহু মানুষের রুজি রোজগারের সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার ভয় রয়েছে সবার। তাই পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নেওয়া প্রতিজ্ঞাগুলো প্রায়শই পিছিয়ে পড়ছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যাপক বিনষ্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কত মানুষ স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে সেই বিষয়টা নির্ধারণ করা হচ্ছে। এবং এই ইকোলজিকাল ফুটপ্রিন্ট কোন দেশের কত তা-ও বের করা হচ্ছে, যা আমেরিকার ক্ষেত্রে ১৯ পয়েন্ট অর্থাৎ অনেক বেশি। ভারতের ক্ষেত্রে এটা মাত্র ৩ পয়েন্ট।

পরিবেশ বিপর্যয় (দ্বিতীয় পর্ব)

বর্তমানে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে বিশ্ব তাপায়নের ফলে বর্ষা আসছে আরো এক মাস পরে পরে। জুলাই মাসে বৃষ্টিপাত আগের চাইতে শতকার ১৫% কমে গেছে অথচ আগস্টে বেড়ে যায় শতকরা ১০%। কারণ তখন বাতাসে বেড়ে যায় জলীয় বাষ্প। কিন্তু তার আগের মাস পর্যন্ত খরায় ধানের চারাগুলো অনেক মরে যায়, কৃষক বর্ষার জল না পেয়ে ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ জল। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বেশি কমে গেলে দ্রবীভূত আর্সেনিক, যা সাধারণভাবে বিপজ্জনক হয় না, সেটাই কম জলে ঘন হয় এবং মানুষের সহনসীমার ওপরে গিয়ে ক্ষতিকারক হয়।

বিশ্ব তাপায়নের ফলে যেমন ঝড়ঝঞ্ঝার প্রকোপ বেড়েছে তেমনি স্থলভাগের হিমবাহ গলে এবং সাগরের জল ফেঁপে

উঠে বিশ্বের সাগরতল গড়ে ২ মিলিমিটার করে প্রতি বছর বেড়ে উঠছে। উপকূলের যে যে জায়গায় ভূতাত্ত্বিক কারণে ওঠানামা আছে সেখানে সাগরতলের এই ওপরে ওঠার হারও কম বা বেশি হয়। যেমন সুন্দরবনের ক্ষেত্রে বিশ্বের গড় হার থেকে অনেক বেশি হারে জল ওপরে উঠছে। কারণ বাংলা বেসিন ক্রমশ পূব দিকে হেলে যাচ্ছে। অথচ দিঘা বা তামিলনাড়ুর উপকূলে সমুদ্রতলের উপরে ওঠার হার ২ মিলিমিটার থেকে অনেক কম। বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রতল যে ভাবে উঁচু হচ্ছে তাতে মনে করা হয় ২০ বছর পর ০.২৫ মিটার উচ্চতা বাড়বে। উপকূলের নদীর জল অনেক দূর পর্যন্ত লবণাক্ত হয়ে উঠবে। সুন্দরবনের নদী নালা মোহনার কাছাকাছি গত তিন দশকে শতকরা ২০% বেশি লোনা হয়েছে। অতএব আর দু-দশক পরে আরো ১০-১৫% বেশি হবে। এতে বাঘেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটবে। উত্তরদিকের খাড়িগুলোতে লোনা কম বলে সেখানে ভিড় করবে এবং আরো বেশি করে লোকালয়ে ঢুকবে। ১৯৮০-র দশকে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ধারের গ্রামগুলোতে গড়ে বছরে ১২ বার বাঘ ঢুকত। এদিকে ২০০০ থেকে ২০১০-এর দশকে সেই গড় ৪০-এ এসে ঠেকেছে। এছাড়া সাগর সংলগ্ন বাদাবনে ঢাকা দ্বীপগুলোর শতকরা ২০ ভাগ এলাকা গত চার দশকে ডুবে গেছে, ফলে কোর এলাকার ভাঙ্গাদুয়ানি, বাঘমারা ইত্যাদি বাঘের জঙ্গল এলাকা সঙ্কুচিত হয়েছে। সুন্দরবনে আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আশির দশকে সুন্দরবনের খাড়িতে যত ডলফিন্ দেখা যেত তার বেশিরভাগই গাঙ্গেয় শুশুক। অথচ এখন প্রায় সব শুশুকই নোনা জল সহনশীল ইরাবতী ডলফিন্।

তবে নদী, খাড়ির জল আরো লোনা হলে বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি করার সুবিধা হবে যা এখন কম লবণাক্ততায় সম্ভব হচ্ছে না। সুন্দরবনে যে ৩৫% এলাকায় এখনো অগভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ করা সম্ভব হচ্ছে তা-ও ক্রমশ লোনা হয়ে যাবে।

সাগরতল দ্রুত ওপরে ওঠার ব্যাপারেও মত বিরোধ রয়েছে। যেমন মালদ্বীপের উপকূল ১৯৭২ সাল পর্যন্ত যথেষ্ট দ্রুত ওপরে উঠেছিল বটে, কিন্তু তার পর থেকে একই রকম রয়েছে। এছাড়া সাগরতল ওপরে উঠলে Angular Momentum-এর কারণে পৃথিবীর আহ্নিক গতি মন্থর হয়ে যাবার কথা। অথচ নাসার মাপ অনুসারে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ১৯৭২ সালের পর থেকে আরো দ্রুত হয়ে গেছে। এ থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে সারা বিশ্বের সাগরতল উত্তরণের গড় হার ১৯৭২ সাল থেকে আর বাড়ে নি।

এসব তো গেল তর্ক বিতর্কের কথা। কিন্তু আমাদের সুন্দরবনের ক্ষেত্রে সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়েই চলেছে। সারা বিশ্বের গড় সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়ার হার যেখানে বছরে ২ মি.মি. করে সেখানে সুন্দরবনে হল ৫ থেকে ১০ মি. মি. পর্যন্ত। এর ফলে আগেই বলেছি যে খাড়ি এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তর ক্রমশ লবণাক্ত হয়ে যাচ্ছে। তারই ফলশ্রুতি হল এক ফসলা ধানেরও উৎপাদন কমে যাওয়া; এমন কি সুন্দরবনের বাঘেরও কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে শারীরিক দুর্গতি ঘটা। এ কারণে বাঘের ওজনও যথেষ্ট কমে যাচ্ছে।

হুগলি নদীতে যে হারে লবণাক্ততা বাড়ছে তাতে মিঠে জলের মাছ অচিরে লোপাট হবে, এবং পার্শে জাতীয় মুলেট মাছের আগমন হলেও অবাক হবার নয়। এখনই তো বাবুঘাটের কাছে চাক ক্যাওড়া জাতীয় বাদা গাছের আবির্ভাব ঘটেছে। বিশ বছর পর নৈহাটি পর্যন্ত হুগলি নদীর দুধারে হরগোজা, বানি, গেঁওয়া গাছের সারিও দেখা যাবে। তাতে অবশ্য দূষিত হুগলির জল ম্যানগ্রোভ ফিল্টারে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে।

সবার চেয়ে ভীতিজনক হচ্ছে, অনেক নামীদামী লোক লিখতে আরম্ভ করেছেন যে বিশ্ব তাপায়ন একটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ঘটনা, সেখানে মানুষের হাত ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। তাঁদের মতে এই তাপায়নের ওঠা নামার জন্যে অনেকাংশেই দায়ী সৌর কলঙ্ক বা সান স্পট। কিন্তু পরিবেশের অবনয়নে মানুষের হাত যে আছে তা আই পি সি সি-র গবেষণায় যথেষ্ট প্রমাণ সহ উল্লেখ করা হেয়েছে।

যাই হোক, এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণের কথা ভেবে যেন আমরা হাত গুটিয়ে বসে না থাকি এবং বিশ্ব পরিবেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে সমবেত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি।

উমা

বইমেলায় উৎস মানুষ

স্টল নম্বর ৪৮৩

(৯ নং গেট দিয়ে ঢুকে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন-এর উল্টোদিকে।)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যার উৎস মানুষই

অতনু বিশ্বাস

কলিনস ডিকশনারি তাদের ২০২৩-এর 'ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত করেছে 'এআই'-কে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে কতটা পরিমাণে আমাদের জীবন, জীবনশৈলী এবং কথোপকথনের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে, তার একটা ছবি পাওয়া সম্ভব এর মধ্য দিয়ে।

আসলে আমাদের জীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই বিপ্লব, এই দুর্বার জোয়ারটা এসেছে বছর খানেক ধরেই। ২০২২-এর অক্টোবরের শেষে সাম অল্টম্যানের নেতৃত্বে 'ওপেনএআই' নামক মার্কিন সংস্থা বাজারে আনল 'চ্যাটজিপিটি' নামের চ্যাটবট। অর্থাৎ এক কম্পিউটার প্রোগ্রাম যার সঙ্গে কথোপকথন চালানো যায়। সে যেন মানব-মনীষার চিন্তাধারার অন্তঃস্থলে একটা মস্ত বড় ধাক্কা। চ্যাটজিপিটিকে ইতিহাস-ভূগোল, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, এমনকী অনেক অসাধারণ জ্ঞান নিয়েও যে কোনও প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেয় অক্লেশে। তাকে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের স্টাইলে কবিতা লিখতে বললে লিখে দেয় তাও, লিখে দেয় ও হেনরির স্টাইলে গল্পও। সে লিখে দিতে পারে নিউজ রিপোর্ট, বায়োডাটা। করতে পারে আরও হাজারো কাজ।

অবশ্য ইতিমধ্যেই চ্যাটজিপিটি-র চাইতেও অনেক বেশি ওস্তাদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বেরিয়ে গিয়েছে বাজারে। সেটাই তো স্বাভাবিক, কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুনিয়ায় এই উত্তরণটা, এই পরিমার্জনটা হচ্ছে গড়গড়িয়ে, দ্রুতলয়ে। একেবারে এক্সপোনেন্সিয়াল রেটে। তবু, চ্যাটজিপিটি-কে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিবর্তনের ইতিহাসে, বা বলা ভালো, মানব-সভ্যতার ইতিহাসেই বলা চলে একটা পরিবর্তন-বিন্দু। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তো আর হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়ে আমাদের জীবনযাত্রার দখল নিয়ে ফেলেনি, তার পটভূমিটা তৈরি হচ্ছিল অনেক দিন ধরেই, একটু একটু করে। আমরা তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি, এই যা। চ্যাটজিপিটি এসে পড়ে হঠাৎ যেন বিশ্বজনতার চেতনায় ঘা মেরে সটান বুঝিয়ে দিল যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ছিল, আছে, তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়ছে—যেন গুণোত্তর প্রগতিতে, আর ভবিষ্যতে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আচ্ছন্ন করবে আমাদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা পদক্ষেপ। সুতরাং, হে মানুষ, সমঝে চল। পা ফেল সাবধানে। নইলে সমূহ সর্বনাশ।

'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' শব্দবন্ধটির প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৫৬তে। সে বছর কম্পিউটার বিজ্ঞানী মারভিন মিন্ স্কি আর জন ম্যাকার্থি আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ারের ডার্থমাউথ কলেজে আয়োজন করেন আট সপ্তাহব্যাপী এক কর্মশালা, যার নাম ছিল 'ডার্থমাউথ সামার রিসার্চ প্রোজেক্ট অন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স'। এবং জন ম্যাকার্থি-ই প্রথম ব্যবহার করেন 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' শব্দবন্ধটি। তাই প্রায় সাত দশক আমরা কাটিয়ে দিয়েছি কৃত্রিম বুদ্ধি তৈরির তপস্যায়। তাকে আরও বুদ্ধিমন্ত করে তোলার সাধনায়। আজকের এই চমক তাই হঠাৎ এসে হাজির হয় নি। এর পিছনে রয়েছে মানব-মনীষার প্রগাঢ় সাধনা। আলেক্সা কিমবা সিরি-কে নিয়েই তো আমরা কাটিয়ে দিলাম কমবেশি এক দশক। গুগল, জিপিএস, সিস্টেম, ইমেল সিস্টেম, অনলাইনের হাজারো পদ্ধতি যে আমাদের নিত্যদিনের জীবনযাপনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিবিধ ব্যবহারের কিছু উদাহরণ মাত্র তা আমরা সবাই বোধহয় এতদিন বুঝে উঠতে পারিনি ঠিকঠাক। চিকিৎসা-ব্যবস্থা, অপরাধ-দমন, এমনকী বিভিন্ন জায়গায় আইন-ব্যবস্থায় পর্যন্ত এআই-এর অনুপ্রবেশ ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

চ্যাটজিপিটি-ও তো হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ে নি। ২০১৭তে মানুষ-প্রতিম রোবট সোফিয়াকে 'নাগরিকত্ব' দেয় সৌদি আরব। সোফিয়াকে নিয়ে দেশে দেশে হয়েছে নানা অনুষ্ঠান। হয়েছে জমাটি প্রশ্নোত্তরের আসর। সে সব জায়গায় নানা প্রশ্নের অবাক-করা উত্তর দিয়ে সবাইকে বিস্মিত করেছে সোফিয়া। এর পাশাপাশি চলেছে জিপিটি-র মতো বিপ্লবও। চ্যাটজিপিটি-ই তো ওপেনএআই-এর জিপিটি-সিরিজের সাড়ে তিনতম সংস্করণ। মোটামুটি ছ'মাস কিংবা এক-দু'বছর পরপর এই উন্নততর সংস্করণগুলো এসেছে বাজারে। প্রতিটা সংস্করণে অনেকখানি করে উন্নত হয়ে উঠেছে জিপিটি। যেমন, ২০২০র শেষ দিকে জিপিটি-৩ নিয়ে বিস্তর মাতামাতি হচ্ছিল দুনিয়া জুড়ে, অন্তত এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তো বটেই। ব্রিটেনের নামজাদা খবরের কাগজ '*দ্য গার্ডিয়ান*' জিপিটি-৩-কে বলে একটা উত্তর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে দিতে। লিখে দেয় জিপিটি-৩। ছাপা হয় সেই প্রবন্ধটি। তাতে মহাত্মা গান্ধীর উদ্ধৃতি পর্যন্ত রয়েছে। হইচই পড়ে যায় দুনিয়া

জুড়ে। চ্যাটজিপিটি কিন্তু এই জিপিটি-৩-এরই পরের সংস্করণ মাত্র। যদিও ইতিমধ্যেই জিপিটি-৪ পেরিয়ে জিপিটি-৫-এর দিকে হাঁটছে সভ্যতা, চ্যাটজিপিটি কিন্তু স্পষ্টতই একটা বড়সড় ছাপ রেখেছে মানব সভ্যতায়।

চ্যাটজিপিটি-র কথা ভাবলে বাঙালি পাঠকের মনে পড়তে বাধ্য সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কুর গল্প 'কম্পু'র কথা। সেই কম্পু, ফুটবলের দেড়গুণ আকৃতির গোলকাকৃতি কম্পিউটার যন্ত্র, যাকে প্রশ্ন করলে উত্তর দিয়ে দিত অক্লেশে। কম্পুর গল্পটা প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। অবশ্য তার অনেক আগেই বাস্তবের কম্পু কিংবা চ্যাটজিপিটি-র পূর্বসূরির আবির্ভাব ঘটে গিয়েছে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬র মধ্যে এমআইটি-র বিজ্ঞানী জোসেফ ওয়েজেনবাম তৈরি করলেন 'এলিজা' কম্পিউটার প্রোগ্রাম। 'এলিজা' প্রোগ্রাম সে সময়কার প্রেক্ষিতে এক অবাক-করা সাবলীলতায় মানুষের সঙ্গে চালাতে পারত কথোপকথন।

তবে কেবলমাত্র এই ধরনের চ্যাটবট তৈরির মধ্যেই যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতার প্রকাশ ঘটছে তাও তো নয়। চ্যাটজিপিটি-র প্রায় সমসাময়িক ডেল-ই কিংবা মিডজার্নির মতো ছবি তৈরির জেনারেটিভ এআইগুলোর কথাও বলা উচিত এ প্রসঙ্গে। হ্যাঁ, ছবি আঁকা না বলে, ছবি তৈরিই বললাম ইচ্ছে করে। আসলে কয়েকটা শব্দের মধ্যে দিয়ে কী চাওয়া হচ্ছে লিখে দিলেই এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এঁকে দেবে ছবি, যেমন চাওয়া হচ্ছে। তাতে পোপ ফ্রান্সিস স্টাইলিশ ফোলানো জ্যাকেট পরে হাঁটছেন কিংবা প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জোনাল্ড ট্রাম্পকে টেনে-হিঁচড়ে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, এমন নকল ছবি তৈরি করা যাচ্ছে নিমেষে। আর সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে তা ছড়িয়ে পড়বে দুনিয়া জুড়ে, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এমন নকল ছবি, ভিডিও বা অডিও তৈরি করা হয়ে পড়েছে খুবই সহজ। যার পোশাকি নাম 'ডিপফেক'। যা দুনিয়া জুড়ে তৈরি করেছে হইচই। আর এমন অনভিপ্রেত নকল ভিডিও বা অডিও বা ছবিকে কী করে আটকানো যায় তার হিসেব কষতে হয়রান হতে হচ্ছে গোটা দুনিয়ার প্রশাসনকে।

আসলে কৃত্রিম বুদ্ধির সীমানা বহুল-বিস্তৃত। তার পুরো তত্ত্বতালাশ করা একটা প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভব নয়। আর তার কোনও প্রয়োজনও নেই। তবে আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। সেই ১৯৯৭ সালে আইবিএম-এর কম্পিউটার 'ডিপ ব্লু' দাবা খেলায় হারিয়ে দিল গ্যারি কাসপারভকে। গ্যারি কাসপারভ, যিনি সে সময়কার দাবায় বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান, এবং অনেকেই যাঁকে মনে করেন এ যাবৎ কাল পর্যন্ত দুনিয়ার সেরা দাবাড়ু। সেটাও কিন্তু মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যন্ত্রের দখলদারির প্রেক্ষিতে একটা বড়সড় পরিবর্তন বিন্দু। হয়ত চ্যাটজিপিটি-র চাইতেও তীক্ষ্ণ ছিল তার বাঁকখানা। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপর যেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্বলিত যন্ত্রের বিজয়কেতন উড়ল সেদিন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিশিষ্ট যন্ত্র যে মানুষকে ছাপিয়ে যেতে পারে, ছাপিয়ে যাবে, কিংবা ইতিমধ্যেই ছাপিয়ে গিয়েছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে, সেই 'বোধ'-এর জন্ম হল মানুষের মধ্যে, বলা চলে এমনটাও। তারপর কেটেছে শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশেরও বেশি। ইতিমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এগিয়েছে কয়েক যোজন। আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-বিশিষ্ট যন্ত্রের সঙ্গে কোনও মানুষ দাবাড়ুর 'লড়াই'য়ের প্রশ্নই ওঠে না। যন্ত্রগুলো এতটাই উন্নত। তুড়ি মেরে তা হারাবে শ্রেষ্ঠ মানুষ খেলোয়াড়কে। ইতিমধ্যে 'গো', 'সোগি', ইত্যাদি দাবার তুলনায় অনেক জটিল খেলাতেও বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের হারিয়েছে 'ডিপমাইন্ড'-এর আলফাগো, আলফাজিরো ইত্যাদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

এবং আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সীমানা ছাড়াচ্ছে। দ্রুত। মানুষ একে সঠিকভাবে তার জীবনযাত্রার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োগ করতে পারবে কিনা, তাতো বলবে ভবিষ্যৎ। আপাতত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেন আলাদিনের দৈত্য, যা বেরিয়ে পড়েছে বোতল থেকে। তাকে দিয়ে কী কী করানো সম্ভব, তার কতটা সুপ্রযুক্তভাবে নির্দেশ দিতে পারি সেই দৈত্যকে। কতটা শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই দৈত্যের কাজকর্মকে। আমাদেরই উপর নির্ভর করছে তার কর্মকাণ্ড। একটা বিষয় কেবল পরিষ্কার, আর যাই হোক না কেন, দৈত্যকে আবার বোতলে ভরে ফেলা কিন্তু অসম্ভব।

আচ্ছা, কেমন করে কাজ করে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ২০২০তে জিপিটি-৩-কে নিয়ে যখন হইচই হচ্ছিল খুব, সে সময় তাকে একটা প্রশ্ন করা হয়—'হাওয়াই থেকে ১৭-তে ঝাঁপ দিতে কটা রামধনু লাগবে?' 'হাওয়াই' একটা জায়গার নাম, '১৭' একটি সংখ্যা, আর 'রামধনু' নিশ্চয়ই কোনও যানবাহনের নাম কিংবা কোনও দূরত্বের একক নয়। তবু, জিপিটি-৩ কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দেয় সহজ স্বাভাবিকতায়—'দুটো।' বোঝা গেল, বাস্তব পৃথিবী এবং তার স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কোনও ধারণাই নেই। থাকার কথাও নয়। 'হাওয়াই', '১৭', কিংবা

'রামধনু', সবই তার কাছে এক একটা শব্দ, যাদের অন্য কোনও মানে নেই। রামধনু বলতে যে সাতরঙের বাহার আমরা বুঝি, ১৭ অর্থে যে সংখ্যাটার কথা আমাদের মনে হয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সে ধরনের 'বোধ' নেই, থাকতে পারে না। পরের সংস্করণগুলো এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠে ঠিকই। যেমন, চ্যাটজিপিটি-কে আমি নিজেই এই একই প্রশ্ন করে দেখেছি, বা একই ধরনের প্রশ্ন করে দেখেছি, সে ঠিকঠাক জবাব দেয়। এবং প্রশ্নটাই যে ঠিক নয়, বুঝিয়ে দেয় সেটাও। কিন্তু আবার চ্যাটজিপিটির মধ্যেও থেকে যায় অন্য কোনও জট, অন্য কোনও বাস্তববোধের অভাব। আগের সংস্করণের তুলনায় অনেকটা কম হলেও। তবে এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে, জবাব ঠিকঠাক হওয়া মানে এই নয় যে সে বুঝতে পারল 'হাওয়াই', '১৭' বা 'রামধনু' ঠিক কী কী, অর্থাৎ মানুষ যেমনভাবে বোঝে আর কী। তার কাছে সবই একএকটা শব্দ মাত্র। ব্যাস। *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্*-এ ২০২৩-এর এক আটিকেলে চিন্তাবিদ নোম চমস্কি এবং তাঁর সহলেখকরা লিখলেন যে, চ্যাটজিপিটি বা এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো সম্ভবপরের সঙ্গে অসম্ভবের পার্থক্য করতেই পারে না। পারার কথাই নয়।

আসলে মানুষের চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চিন্তাপদ্ধতির বিস্তর পার্থক্য। মানুষের মন এক অতি জটিল প্রকরণ। আমরা অতি অল্প পরিমাণ তথ্য নিয়েই কাজ চালাতে পারি, আমাদের চেতনার রঙে রাঙিয়ে। এই চেতনার বহুবর্ণচ্ছটা যে কীভাবে কোথায় বিচ্ছুরিত হয় তার হদিশ পাওয়া দুঃসাধ্য। এর বিপ্রতীপে চ্যাটজিপিটির মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজ করে প্যাটার্ন ম্যাচিংয়ের মাধ্যমে, তার মধ্যে সঞ্চিত বহু সহস্র টেরাবাইট ডেটা বা তথ্যকে মন্থন করে। ডেটার সমুদ্র মন্থন করে এই উত্তর খুঁজে আনতে গেলে সব সময় যে অমৃতই উঠবে তারও কোনও কথা নেই, উঠতে পারে কালকূট বিষও। তাই মাঝেমধ্যে ভুল বা অর্থহীন অর্থও দিয়ে বসে সে।

আবার ধরা যাক তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সকালে সূর্যোদয়ের সময় আকাশের রঙ কি? সে তার ডেটার তথ্য মন্থন করে দেখল যে ১৭ শতাংশ ক্ষেত্রেই হয়ত বলা আছে আকাশের রঙটা নীল। প্যাটার্ন ম্যাচিং করে সে তাই উত্তর দেবে, নীল। শব্দে শব্দে এক রঙমিলান্তি খেলা খেলে চলেছে সে বিপুল তথ্যকে ঘেঁটে প্যাটার্ন ম্যাচিংয়ের সূত্রকে সম্বল করে। ওদিকে মানুষের মন কোনও এক অবাক-করা সকালে প্রভাত-সূর্যের স্নিগ্ধ আবেশে খুঁজে পেতে পারে এক অনির্বচনীয় স্বর্ণোচ্ছটা। কখনও তার চেতনার ঘটতে পারে নবজাগরণও। তাই মানুষ হয়ত বলে ফেলতে পারে আকাশের নীল সাগরে গলানো সোনার ঢল নেমেছে। বলে ফেলতে পারে অন্য কিছু যা কল্পনা করে আমরা লিখে উঠতে পারব না। এই উত্তর কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, যদি না তাঁর অন্তর্নিহিত তথ্য-সমুদ্রের মধ্যে এমন তথ্য জমানো থাকে বেশ কিছুটা। এখানেই তার কৃত্রিমতা। এবং এখানেই মানুষের চেতনা দশ গোল দেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে।

আবার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি আদৌ 'কৃত্রিম'? তার কর্মপদ্ধতি, অর্থাৎ কাজ করার অ্যালগরিদম তো ঠিক করে দেয় মানুষ। সেই কর্মপদ্ধতির সূত্র মেনেই তার রূপায়ন এবং সমস্ত কাজকর্ম। সাদার্ন ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং মাইক্রোসফটের গবেষক কেট ক্রফোর্ড ২০২১-এ লিখেছেন একটা বই, নাম '*অ্যাটলাস অফ এআই*'। তাতে তিনি বলছেন 'এআই' বা 'আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স'-এর নামটাই বিভ্রান্তিতে ভরা। কারণ, বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ, জ্বালানি, মানুষের শ্রম, এবং অবশ্যই মানুষের যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত এবং সমৃদ্ধ প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা দিয়ে তৈরি হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। তাই মানুষই বোধকরি সব। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রঙের ছটায় আমরা যতই বিস্মিত হতে থাকি না কেন, মনে রাখতে হবে যে এসবের 'উৎস মানুষ'-ই। **উমা**

সংশোধনী

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সংখ্যায় 'বায়ুমণ্ডল পরিচয়' (অঞ্জনকুমার সেনশর্মা) প্রবন্ধে একটি ছবি ছাপা হয়েছে যেটি প্রবন্ধে বায়ুমণ্ডলের স্তরভাগ যেভাবে করা হয়েছে তার সঙ্গে আপাত অসঙ্গতিপূর্ণ। প্রবন্ধে Stratosphere ও Exosphere-এর মধ্যবর্তী স্তরগুলোর উল্লেখ করা হয় নি। ছবিটিতে পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে পারে। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সংখ্যায় 'করে দেখো ভালো লাগবে' (শুভেন্দু দাশগুপ্ত) প্রবন্ধে ৮নং প্যারাগ্রাফে ২য় লাইনে 'আরও একটু পরিষ্কার হলে ভালো হতো' অংশটি বাদ গেছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

গভীর রাতে ভয়ংকরী তিস্তার গ্রাসে বিপন্ন পাহাড়ি জনপদ

শ্যামল ভদ্র

গত বছরের অক্টোবর মাসের ২ তারিখ মঙ্গলবার গভীর রাতে সিকিমের মুগুথান, লাচেন সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল কেঁপে ওঠে। ভূকম্পের তীব্রতা খুব বেশি না হলেও প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে স্থানীয় পাহাড়ি মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সেই আশঙ্কাই সত্যি হল ৩ তারিখ বুধবার ভোরে, যখন ৫২০০ মিটার উচ্চতায় সিকিমের সাউথ লোনাক হ্রদের দেওয়াল ভেঙে প্রায় ৮০ মিটার গভীরতার বরফগলা জল দ্রুতবেগে পাহাড়ি ঢালে পাথর-মাটি বয়ে নিয়ে তিস্তা নদীকে ভয়ংকর করে তোলে। অতিরিক্ত জলোচ্ছ্বাস সেই সাথে প্রচণ্ড গতির পাথর-বালু-মাটির অভিঘাতে সিকিমের একাংশ, পশ্চিমবঙ্গের সেবক, ক্রান্তি ও মেখলিগঞ্জ সহ বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছোট্ট পাহাড়ি জনপদ সিংতাং-এর সেনা ছাউনির ২২ জন সেনাকর্মী, গাড়ি সহ এলাকার ঘর-বাড়ি মুহূর্তের মধ্যে ভেসে চলে যায়। বহু মানুষ নিখোঁজ এবং ১০নং জাতীয় সড়ক ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টি এবং সমতলে অতিরিক্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায়, অক্টোবর ৪, ২০২৩ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তিস্তার তীরবর্তী চর থেকে বিশেষ করে তিস্তার তীরবর্তী জলপাইগুড়ি ও মেখলিগঞ্জ শহরের মানুষজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলা হয়। ফলত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে সতর্ক করেছিল 'বরফ-হ্রদে বিপদঘণ্টা' নামক শিরোনামে। সেই বরফ-হ্রদই বিপর্যয় ঘটালো পাহাড়ি জনপদে। কেউ শোনে নি সে কথা।

ঠিক এরকমই ৫৫ বছর আগে লক্ষ্মীপুজোর রাত ৪অক্টোবর, ১৯৬৮, হঠাৎ তিস্তার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে জলপাইগুড়ি শহরের পূর্বদিকে বাঁধ এবং পশ্চিম পারে দোমোহনীর বাঁধ ভেঙ্গে দুটি শহরকে প্লাবিত করে। জলের প্রবল স্রোতে বহু মানুষ ও গবাদি পশু ভেসে যায়, অল্প সময়ে প্লাবিত অঞ্চলগুলি ১৫ থেকে ২০ ফুট জলের তলায় চলে যায়। সেই বিধ্বংসী বন্যায় ভয়ঙ্কর রূপ আজও বয়স্ক মানুষদের স্মৃতিতে অমলিন। তবে গত বছরের তিস্তার জলোচ্ছ্বাস সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে পাহাড়ি অঞ্চলে। ছোট্ট শহর সিকিমের সিংতাং—যার বেশিরভাগ ঘরবাড়ি ভেসে গেছে নতুবা ১৫ থেকে ২০ ফুট পাথর পলিমাটিতে ঢাকা পড়ে গেছে। জলপাইগুড়িতে তিস্তার নিম্ন অববাহিকায় সেইসব পাহাড়ি অঞ্চলের ভেসে আসা মৃতদেহ এবং গৃহস্থালির জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সিকিমের চুনথাং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আরও একটু নিচের দিকে ডিকচু ও কালিঝোরা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ছয়টি সড়ক-সেতু ভেঙ্গে গেছে। শিলিগুড়ির কাছে গজলডোবায় তিস্তার বাঁধ থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়া হয় এবং সেখানেও বেশ কিছু মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। সেই সময়ে ধস এবং তিস্তার ভয়ংকর রূপ স্থানীয় মানুষজনকে আরও বেশি আতঙ্কিত করে তুলেছিল। বেশ কিছুদিন পাহাড়ের জনজীবন সমতলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। উল্লেখ্য উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ নদীই নদীবিজ্ঞানের বাস্তব জ্ঞানের সঙ্গে মেলে না, তাই সাহিত্যিক দেবেশ রায় তাঁর 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' বইতে উল্লেখ করেছেন যে, নদীনালাগুলোকে নদীর মতো থাকতে দেওয়া হোক, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে রুদ্ধ করার দরকার নেই। গজলডোবায় তিস্তা-ব্যারেজ উদ্বোধনের পর তিনি বলেছিলেন যে তিস্তা এখন ইতিহাস হয়ে গেল, প্রকৃতির সেই খরস্রোতা নদীর পুনর্জন্ম ঘটবে মানুষের হাতে।

প্রায় প্রতি বছরই বর্ষায় উত্তরবঙ্গের নদ-নদীতে বন্যা সমতলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগের কারণ। আর পাহাড়ি অঞ্চলে ধস মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তোলে। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে বিশেষ কাজে জলপাইগুড়ি গিয়েছিলাম নিজের বাড়িতে, ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেলে গিয়েছিলাম জলপাইগুড়ি শহরের পূর্বপ্রান্তে বাঁধের ওপর থেকে তিস্তা নদীকে দেখতে। জায়গাটির নাম কিং-সাহেবের ঘাট। কিন্তু বাঁধের ওপর থেকে যতদূর চোখ যায় দেখলাম তিস্তার চরে গাছপালা শস্যক্ষেত আর ছোট ছোট জনবসতি। তিস্তার ক্ষীণ জলের ধারা সরে গেছে দূরে পূর্বপ্রান্তে। হতাশই হলাম কারণ কয়েক বছর আগেও তিস্তার জলধারা বাঁধের ওপর দাঁড়িয়েই দেখা যেত। গজলডোবায় তিস্তা ব্যারেজই এর মূল কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে, তিস্তার নিম্ন অববাহিকায় জলের যোগান কম থাকায় বিস্তীর্ণ চর নদীর দুই কূলেই জেগে উঠেছে। অর্থাৎ দেবেশ রায়ের কথায় তিস্তার পুনর্জন্ম হল সেই মানুষের হাতে। অন্যদিকে অত্যন্ত উর্বর এই চরগুলোতে শস্য ও অন্যান্য শাক সবজির

ফলন স্বাভাবিকের থেকেও বেশি, তাই এই সব অঞ্চলে দ্রুত জনবসতি গড়ে উঠছে। তাই আশংকা তিস্তায় অস্বাভাবিক জলস্ফীতি হলে ওই সব জনবসতি মুহূর্তেই ভেসে চলে যাবে। বাস্তব পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক, অথচ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উদাসীন। মাঝে মাঝে তিস্তা বাঁচাও আন্দোলন হয় ঠিকই কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর কোনো প্রভাবই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত।

তিস্তার উৎসমুখ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, তবে পূর্ব হিমালয়ের হিমবাহগুলি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ছোট বড় পাহাড়ি নদী তিস্তার জলকে পুষ্ট করছে। গ্রীষ্মকালে মূল স্রোতে বেশি জল থাকে না, তদুপরি বিভিন্ন উচ্চতায় বিদ্যুৎপ্রকল্প এবং বেশ কিছু বাঁধ তৈরির ফলে সুখা-মরসুমে ভাটিতে অর্থাৎ তিস্তার নিম্ন অববাহিকায় জলের পরিমাণ কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। উল্লেখ্য তিস্তার তীর বরাবর বিভিন্ন জনজাতির বাস, মূলত পাহাড়ে লেপচা এবং সমতলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য ছিল, এখন চিত্রটা অনেকটাই পাল্টে গেছে। এই সম্প্রদায়ের মানুষরা তিস্তাকে পবিত্র মনে করে পূজা করে। তাই নানারকমের গান-ছড়া এখনো সেখানে শুনতে পাওয়া যায়। নদী সম্পর্কে এঁদের জ্ঞান অসামান্য কিন্তু পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা শোনা হয় না। সেই সাথে তিস্তার জল বন্টনকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনা অব্যাহত, সুরাহা আজ পর্যন্ত হয় নি। এ ছাড়াও নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের চাপে নদীকেন্দ্রিক সমস্যা বেড়েই চলেছে।

তাহলে সমস্যার সমাধান হবে কি করে? উত্তরবঙ্গে নদীগুলির সামগ্রিক মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি, প্রয়োজন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে উত্তরবঙ্গের জন্যে 'ভূ-বৈচিত্র এবং নদী কমিশন' গঠন করে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা এবং প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা। প্রশাসনিক উদ্যোগের পাশাপাশি অবশ্যই স্থানীয় মানষজনকে নদীর ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে এবং নদীকে নিজের পরিবারের অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তথ্যসূত্র :

উত্তরবঙ্গ সংবাদ, অক্টোবর ৩,৪,৫, ২০২৩ সংখ্যা।
উত্তরবঙ্গে নদ-নদী, অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, রক্তকরবী, ২০২১।

উমা

১৫ পাতার পর

হচ্ছে—Save Ajodhya Hills Purulia. পাহাড়কে ঘিরে গড়ে উঠছে বড় বড় বাড়ি, হোটেল। তৈরী হচ্ছে বিশাল চওড়া রাস্তা। হয়েছে লোয়ার ড্যাম, আপার ড্যাম। বাইরের থেকে আসছেন প্রচুর মানুষজন। আর সব কিছুর শত্রু যেন ঐ বড় বড় গাছগুলো। তাদের নিকেশ করো। কিন্তু দুখু তা সইতে পারেন না। দূর্বল মানুষ। গরীব মানুষ। জোরালো প্রতিবাদও করতে পারেন না। তাই অনেকটা জায়গা-কোথাও ফাঁকা দেখলেই পরের দিন নিয়ে আসেন বেশ কিছু গাছের চারা। লাগিয়ে দেন। হতে পারে বট, হতে পারে অশত্থ বা করম বা পলাশ বা খেজুর বা অন্য যা কিছু। তিনি মনে করেন খেজুর লাগালে তা নষ্ট হবার কোন ভয় থাকে না, তাই লাগিয়েছেন প্রচুর খেজুর। লাগিয়েছেন প্রচুর পলাশ। পলাশ পুরুলিয়ার আইডেন্টিইট। না, না, তাঁর সেরকম বাছ-বিচার নেই, গাছ হলেই হল। তিনি মনে করেন প্রকৃতির থেকে শুধু নেওয়া নয়, কিছু দিতেও তো হবে। তাই শুধু পলাশ বা খেজুর নয়, লাগিয়েছেন নিমও। তাঁর কথা হল—যেখানে পারো গাছ লাগাও। দু'দিনে নষ্ট হয়ে যাবে সেরকম নয়; বড় হবে সেইরকম গাছ লাগাও। পৃথিবীকে সবুজ করতে হবে। আমাদের এ কাজ যে করতেই হবে। কিন্তু আবার বলি এসব তিনি করেন পুরস্কারের জন্য নয়। ফেসবুকে বাড়ি বাড়ি নিজের ছবি ঘোরানোর জন্যও নয়। না তাঁর কাছে কোন লাইক আসে না, আসে না কমেন্টস। আর আসবে কিভাবে, হাতে তো কোন বড় ফোনই নেই।

অবশ্য তিনি জানুন বা না জানুন আমরা জানি, পুরুলিয়ার রুখা মাটিতে এতো সহজে নামের ফুল ফোটে না। সুনামের সুগন্ধও ছড়ায় না। ফুল না ফুটুক, সুগন্ধ না ছড়াক। কাউকে না কাউকে কাজটা তো করতে হবে। দুখু মাঝি তাই কাজ করেন। তিনি কাজের মানুষ। গাছ লাগানোর কাজ করেন। যেমন পুরুলিয়ার নিরুপমা অধিকারী করে গেছেন তাঁর কাজ। অন্য জেলা হলে হয়তো অন্যরকম খবর হত। আবার বলি, পুরুলিয়ার মাটিতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা কাজের আনন্দেই কাজ করেন। যাইহোক, দুখু মাঝি গাছ লাগিয়ে চলেছেন- এক গ্রাম থেকে অন্য আর এক গ্রামে। রাস্তার দু'পাশে। অন্যের বাগানে। ফাঁকা জায়গায়। দিনের পর দিন বিনা পারিশ্রমিকে, কোন প্রত্যাশা না করে এই কাজটি করে চলেছেন। প্রায় হাজার তিনেক গাছ ইতিমধ্যেই লাগিয়ে ফেলেছেন। তাই কিছু মানুষের কাছে (অবশ্যই পুরুলিয়ার সকলের কাছে নয়, আগেই বলেছি আমার সন্দেহ আছে কতজনের কাছে তিনি সুপরিচিত) তিনি এক 'বৃক্ষ মানব'।

তাঁর সাইকেলেও লেখা আছে এই উপাধিটি। তা এই বৃক্ষ মানব এমন এক ঘরে থাকেন যেখানে বর্ষার সময় ভিজতে বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে গেলে বাইরে বেরোতে হয় না। স্ত্রী আছেন। দারিদ্রতা ভাগ করে নেন। কোন অভিযোগ নেই। আর যেহেতু অর্ধাঙ্গিনী তাই, গাছের ক্ষেত্রেও অর্ধেক সাহায্য করতে হয় বই কি। সাথ দিতে হয় দুখুর তৈরি ঝুমুর গানে। গানে করার সময় মাঝে মাঝেই স্ত্রীকে সতর্ক করেন। বলেন— হাত জোড় কর। আসলে তিনি যা বলতে চান তা অহংকার করে নয়, যা বলতে চান তা বিনয়ের সাথেই সকলকে জানাতে চান।

সংসার চলে বার্ধক্য ভাতায়। না, এখনো বাড়ি তৈরির টাকা কোথাও থেকেই পান নি। তাই ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো। দুটি ছেলে আছে। একটির শারীরিক সমস্যা রয়েছে। সংসারের হাজারো সমস্যার মধ্যে তাঁর এটিও একটি বড় সমস্যা। কিন্তু কোন সমস্যার জায়গা নেই গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে। আর লাগানো গাছ যাতে কেউ ভেঙ্গে বা তুলে নিয়ে যেতে না পারে তাই তিনি একটি সুন্দর উপায় বার করেছেন। শিশু গাছগুলিতে বেড়া দেন শ্মশান থেকে আধ পোড়া কাঠ নিয়ে এসে। ভুতের ভয়ে গাছ ভাঙা তো দূর অস্ত ঐ গাছের দিকে কোন জনমানব কখনও এগোন না। নিজেই যে গান বেঁধেছেন তার বিষয়ও বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না- গাছ লাগানো, তার উপকারিতা। যদি কেউ যান তাঁর বাড়িতে, পরম আত্মীয়তা নিয়ে তিনি কোন রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই তাঁকে বা তাঁদেরকে শোনাবেন তাঁর সেই নিজের বাঁধা গান। যে গানে রয়েছে প্রকৃতিকে সুস্থ রাখার জন্য গাছেদের প্রয়োজনীয়তা। দুখুর গাছ শুধু চড়িদা বা তোড়াং বা ডাভা বা বুড়দা মানে বাঘমুণ্ডির আশেপাশের গ্রামগুলিতে নয়, বাঘমুণ্ডি থানাতেও রয়েছে। তাঁর বক্তব্য— 'আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, যতদিন পারবো, এইভাবেই গাছ লাগিয়ে যাব। আপনাদেরও অনুরোধ যে যতগুলো পারেন গাছ লাগান। গাছ আছে তাই আমরা আছি গাছ না থাকলে আমরাও থাকব না।'

আমার মনে হয় তথাকথিত পড়াশোনা জানা শিক্ষিত (আমরা যাদের শিক্ষিত বলে থাকি আরকি!) মানুষজন; স্কুলের গণ্ডি না পার হওয়া অশিক্ষিত (আমাদের প্রচলিত ধারণা) মানুষটির কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। না, একটু ভুল বললাম। শেখার নয় বুঝে নেবার। বুঝলাম লক্ষ্যে অবিচল মানুষ এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। আর তাঁরা রয়েছেন খুব দূরে নয়, আমাদেরই আশেপাশে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষজনদের শুধু যা প্রয়োজন তা হল একটু চোখ-কান খোলা রাখা। হ্যাঁ, আর একটি তেতো কিন্তু নির্ভেজাল সত্য দুখু মাঝির সাথে কথা বলে বোধগম্য হল - আমার, মানে আমাদের মতো মানুষের প্রকৃত শিক্ষিত হতে— মানুষ হতে—কিভাবে বাঁচতে হয়— তা জানতে—এখনো অনেক, অনেক বাকি।

যে কথা বলে শুরু করেছিলাম সেই কথার সূত্র ধরেই শেষ করি। আমরা জানি সুন্দরলাল বহুগুণার কথা। আমরা জানি পদ্মশ্রী প্রাপ্ত আসামের যাদব মোলাই-এর 'ফরেস্ট ম্যান অফ ইণ্ডিয়া' বলে পরিচিতি। আবার আমরা জানি মারিমুথু যোগনাথনের কথা তামিলনাড়ুর একজন বাস কণ্ডাকটর থাকলেও এখন তিনি 'ট্রি ম্যান অফ ইণ্ডিয়া' বলে পরিচিত। অথবা কর্নাটকের সালুমারদা থিমাক্কাকে যিনি গাছদেরকে সন্তান স্নেহে পালন করেন। এনাদের অনেক ভালোভাবে জানলেও আমরা অনেকটাই কম জানি আমাদের পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম, বাঘমুণ্ডির থেকে চার কিমি, চড়িদার থেকে দেড় কিমি দূরে বসবাস করা দুখু মাঝিকে। না, দুখু মাঝি বা তাঁর পরিবারের আমাদের এই জানা বা না জানাতে খুব একটা আসে যায় না। কোন দরকারও নেই কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমাদের নিজেদের স্বার্থে, এই প্রকৃতির স্বার্থে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো বড় প্রয়োজন। আসুন এই সাধারণ-অসাধারণ মানুষটির কাছে আমরা মাথা নত করি, তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি। মানুষটিকে আমরা আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা। **উমা**

কেতাব e ketab

উৎস মানুষের ১৯৮০ সালের প্রতিটি সংখ্যা এবং কিছু বই কেতাব-ই বাংলা পোর্টালে পাওয়া যাবে। কেতাব-ই বাংলা সাহিত্য ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনের একটি প্ল্যাটফর্ম। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কাব্যের যে বিপুল সম্ভার বাংলায় রয়েছে, তাকে পাঠকের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়াই এই প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য।

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 30.00
৪৪তম বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ৩০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**
হারিতের ফোন নং — ৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

গ্রাহক চাঁদা (বাৎসরিক) ১৫০ টাকা (চারটি সংখ্যার জন্য) উৎস মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া যায়। স্পিড পোস্টে নিলে ২২০ টাকা জমা দিতে হবে।

Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. PUNB0058400

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ফোনে বা ই-মেলে নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নং ও ই-মেল দেবেন আর কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাবেন। সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়। ডাকে পত্রিকা না পেলে আমরা সংখ্যাটি দ্বিতীয়বার পাঠাতে পারব না। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা করা হয়।

ওয়েবসাইট : **https://www.utsomanush.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
Facebook : https://www.facebook.com/

পুস্তক তালিকা

জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজেঙ্গ	
বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	১৫০.০০
স্বাস্থ্যের সাতকাহন : গৌতম মিস্ত্রী	২৫০.০০
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১০০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	১৫০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	
নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	
অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১২০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ:	
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু:	
হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, সেতু প্রকাশনী, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। প্রতিক্ষণ, ৫ সূর্য সেন স্ট্রীট।
হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।